

অশ্রুমতী

—এ্যান আনহ্যাপি গার্ল—

(তুর্গেনিভ), ই সা

॥ অনুবাদ ॥

শিশির সেনগুপ্ত

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

অগ্রণী বুক ক্লাব

কলিকাতা-৬

[উপন্যাসটি অগ্রণী মাসিক পত্রিকায় ধারা প্রকাশিত]

প্রকাশক

প্রফুল্লকুমার রায়

অগ্রণী বুক ক্লাব

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর

প্রফুল্লকুমার রায়

অগ্রণী প্রেস

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট

পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক ও কভার

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

৭২।১ কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

আড়াই টাকা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

এই লেখকদের অন্যান্য বই

॥ প্রবন্ধ ॥

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

জাগ্রত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

॥ অনুবাদ ॥

জোহান বয়ার	...	গ্রেট হাঙ্গার
	...	পাওয়ার অফ্ এ লাই
রোমানফ	...	কিসলিয়াকভ
জেন অস্টেন	...	দর্পিতা
	...	কন্যা কাহিনী
চার্লস ডিকেন্স	...	দুই নগরের গল্প
ন্যাথানিয়েল হথর্ন	...	মৃগতৃষ্ণা
ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক	...	মায়াবর্তী

শিশির সেনগুপ্তের উপন্যাস

সূর্যতপস্যা

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ীর

পিনোসিয়ো

আমার দিকে চেয়ে বন্ধু শুরু করলে—সেই কথাই ত তোমায় বলছি। সেসব দিনের স্মৃতি বড় কষ্টের। জীবনখাতার বড়ো বেদনার অধ্যায় সেসব। অতীতের অন্ধকার কবর থেকে তাকে আর জাগিয়ে লাভ কি ভাই ?

তবু তোমাকে বলতেই হবে সে কাহিনী।

শোন, তবে বলি।

॥ ১ ॥

সময়টা তখন শীতকাল। বছরটাও মনে আছে। পঁয়ত্রিশ সাল। তখন আমি আমার এক মাসির বাড়ি থাকি। মা মারা গেছেন। মাসির কাছে গচ্ছিত হয়ে আছি আমি। আমার বয়স হবে তখন আঠারো। কলেজে সবে দ্বিতীয় বার্ষিক থেকে তৃতীয় বার্ষিকে উঠেছি। সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম আমি।

আমার মাসিমা ছিলেন শান্ত প্রকৃতির নির্বিরোধী মেয়েমানুষ। মেশোমশায় মারা গিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। মাসিমার বাড়ি-টিও ছিল মস্ত। আগাগোড়া কাঠের তৈরী। সে-সময় কাঠের তৈরী অমন চমৎকার আরামী বাড়ি মস্কো ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাওয়া যেত না এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

একলা ঘরকুনো আমার মাসিমা কারুর সঙ্গে বড়ো একটা দেখাশুনা করতেন না। সকাল থেকে রাত অবধি বসার ঘরে আপন খেয়ালে কাটিয়ে দিতেন। নিরন্তর সঙ্গে থাকত দুটি সঙ্গিনী। আরামের মধ্যে ছিল সেকালের সবচেয়ে সেরা চা খাওয়া। সময় কাটত তাসের খেলা পেসেন্স খেলে। মাসির দোষের মধ্যে এক বাতিক ছিল। ক্ষণে ক্ষণে তাগিদ লেগেই থাকত, ঘরে ধোঁয়া দাও।

ধোঁয়া দাও। পুরোনো কাঠের গন্ধ একদম সইতে পারতেন না নাকে। আর মুখের কথা খসবার তর সইত না। গিন্নীর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই একজন ছুটে যেত হল ঘরে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক বুড়ো চাকর তামার থালার উপর গরম ইঁট বসিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে আসত। সেই ইঁটের উপর পুদিনা পাতা রেখে তার উপর ভিনিগার ছড়িয়ে সে ধোঁয়ায় ভরে দিত ঘর। মেঝেয় পাতা কার্পেটের সরু সরু ফালি বেয়ে ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াত সে আর ভিনিগার ছড়িয়ে ছড়িয়ে ধোঁয়া দিত গিন্নীকে খুশি করতে। সাদা ধোঁয়ায় বুড়ো চাকরটার শুকনো মুখ ভরে উঠত। চোখ জ্বলত। গলা জ্বালা করত নিশ্চয়ই। মুখখানা কেমন যেন বিরূপ করে সে ছুটে বেরিয়ে যেত ঘর থেকে। পোড়া পুদিনা শাকের পট পট শব্দে আর ধোঁয়ায় খাবার ঘরের ক্যানারী পাখাগুলো ভয়ে অস্বস্তিতে কিচ কিচ করে অশ্রান্ত কলরব করত। বেশ খানিক-ক্ষণের জন্যে তাদের কচকচানিতে ঘরে বাইরে কান পাতা দায় হত।

তারপর আবার সব চুপচাপ চলত। কিন্তু সে কতক্ষণ। তক্ষুনি আবার হুকুম হত—গেলাম। গেলাম। ধোঁয়া দাও। ঘরে ধোঁয়া দাও।

আমি বাপ-মা মরা ছেলে। মাসি আদর দিয়ে আমায় একেবারে মাটি করে ফেলেছিলেন।

বাড়ির নিচেরতলাটা ছিল সম্পূর্ণ আমার দখলে। আমার ঘরগুলো পরিপাটি করে সাজানো গোছানো থাকত। বিলাসব্যসনের উপকরণ এগিয়ে দিয়েছিলেন আমার মাসিমা। শোবার ঘরে জানালায় ঝুলত গোলাপী পর্দা আর আমি যেখানটায় শুতাম সেখানে টাঙানো থাকত নীল গোলাপফুলে কাজকরা প্রকাণ্ড এক মসলিনের চাঁদোয়া।

অল্পবয়সী মেয়েদের ঘরেই এই সব মানায় ভাল। অথচ আমার বারণ শুনতে চাইতেন না মাসিমা। আমার সহপাঠিদের চোখে আমায় হেয় প্রতিপন্ন করাই যেন এই সমস্ত মেয়েলিপনার উদ্দেশ্য ছিল। সত্যিই আমায় তারা বোর্ডিং-স্কুলের খুকি বলে ঠাট্টা করত। শত চেষ্টা করেও কোনদিন ধুমপানের সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। নিজের দোষ ঢাকতে চাই না। বছরের গোড়ার দিকটা হেলাফেলায় কাটিয়েছি। লেখাপড়ার প্রায় ধার ধারতুম না। বাড়ির বাইরেই কেটে যেত সময়। মাসিমা আমার ব্যবহারের জন্য দুই ঘোড়ায় টানা মস্ত একটা স্লেজ দিয়েছিলেন যা জাঁদরেল জেনারেলদেরই শোভা পায়। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে যেতুম খুবই কম—সমাজেও মেলামেশা করতুম না। কিন্তু থিয়েটারে ছিল আমার অবাধ গতি আর রেস্তোরাঁয় চলত নিত্য খানাপিনা। অবশ্য কোনোরকম বেয়াদপি করতুম না। আমার আচারআচরণ ছিল ভদ্র। জীবন গেলেও মাসিমার মনে দুঃখ দিতে পারতুম না। আর তাছাড়া সে বয়সে আমার স্বভাবটাই ছিল অতি ঠাণ্ডা ধাতের।

॥ ২ ॥

ছোটবেলা থেকেই আমি দাবা খেলার একজন ভারি ভক্ত ছিলাম। দাবা খেলার যে একটা বিজ্ঞানসম্মত রীতি আছে, তা আবার গুণীর কাছে শিখতে হয় খুব যত্ন করে, সে-সম্বন্ধে হয়ত কোনো ধারণাই ছিল না, কিন্তু খুব খারাপ খেলতাম না আমি। একদিন কাফেতে দু'জন লোক দাবা খেলছিল—খেলা চলেছিল বেশ খানিক-ক্ষণ ধরে। আমি বসে বসে খেলা দেখছিলাম। খেলোয়াড় দু'জনের মধ্যে যার বয়স হবে বছর পঁচিশ, এক মাথা সুন্দর চুল, তাকেই

আমার পাকা খেলোয়াড় মনে হল। খেলাটি শেষও হল তার অনুকূলে। আমার সঙ্গে এক দান খেলার জন্য আহ্বান জানালাম তাকে। সেও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে পর পর তিনবার কিস্তি দিয়ে মাত করলে সে আমাকে।

এই পরাজয়ে হয়ত আমার আত্মসম্মানে আঘাত লেগে থাকবে মনে করে সে মিষ্টি সুহাস গলায় বললে—দাবা খেলায় আপনার স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। কিন্তু খেলা কোথা থেকে শুরু করতে হয় জানেন না আপনি। দাবা খেলার বই পড়া দরকার।

ঠিক বলেছেন। কিন্তু সেরকম বই পাই কোথায়?

আমার আছে। আসবেন আমার বাড়ি, দেব।

এই বলে সে নিজের নাম ঠিকানা দিল আমাকে। পরের দিনই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আর এক সপ্তাহ পরে আমাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। বন্ধুত্বের জন্যে যে দীর্ঘ পরিচয়ের গৌরচন্দ্রিকা দরকার হয় না, এতদিনে সে অভিজ্ঞতা আমার হল।

॥ ৩ ॥

আমার নতুন বন্ধুটির নাম ফাস্তোভ। থাকার মধ্যে বিধবা মা। তার মায়ের হাতে বেশ টাকাপয়সা ছিল। ওদের বাড়িটিও ছিল চমৎকার। কিন্তু ও থাকত একলা পাশের একটি আলাদা বাড়িতে। ঠিক যেমনটি আমি ছিলাম মাসির বাড়িতে। ফাস্তোভ কি একটা কাজ করত আদালতে।

দেখতে দেখতে আমাদের দুজনের মধ্যে খুবই ভালবাসা জমে উঠল। এরকম স্নিগ্ধ মানুষের সঙ্গে জীবনে আমার এই প্রথম

পরিচয়। তার যা কিছু সবই যেন অনবদ্য, চিত্তহারী। যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি সুমধুর কণ্ঠ। তেমনি নিখুঁত চালচলন ব্যবহার। বিশেষ করে তার কমনীয় মুখশ্রী, সোনা আর নীলে গলা চোখ আর সুন্দর সুগঠিত নাক সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। ওর ফুলের পাপড়ির মত পাতলা গোলাপী ওষ্ঠাধরে মধুর হাসিটি যেন সবসময় লেগেই থাকত। আর তুষারসাদা ছোট্ট কপালের দু পাশে দোল খেত দুটি রেশমী চুলের গুছি। ওর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমুদ্রের মত অতল স্নিগ্ধ প্রশান্তি আর সহজ অমায়িকতা। কোনো সময়েই মন খারাপ করে ওকে বসে থাকতে দেখিনি জীবনে। যা কিছু আসে তাতেই ওর সন্তুষ্টি। কোনো কিছু নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হওয়া কি বাড়াবাড়ি করাটাকে ও বর্বরতা মনে করত। কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে সোনালী চোখ দুটি অর্ধনিমিলিত করে বলত—ও সব গেঁয়ো ব্যাপার। একেবারে অচল, অচল।

অদ্ভুত লাগত কাস্তোভের ঐ চোখ জোড়া। দুটি চোখ থেকে সবসময় যেন করুণা মমতা গলে পড়ে। অবশ্য অনেকদিন পরে আমি জেনেছি—ওর চোখের ঐ ভাব মনের ভালমানুষীর প্রকাশ নয়। এমন কি খেতে শুতে কোনো সময়েই তার হেরফের হয় না। ওর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রবাদবাক্যের মত ছিল। ওর ঠাকুমা ছিলেন জার্মান—হয়ত তাঁর কাছ থেকেই ও পেয়েছিল ঐ নিয়মনিষ্ঠা আর সংযম। ভগবান ওকে যেন সর্বগুণালংকৃত করে সংসারে পাঠিয়েছেন। প্রকৃতির দানে কার্পণ্য ছিল না কোথাও। তিল তিল করে তিলোত্তম। নাচে যেমন ছিল ওর অপুর্ব দক্ষতা, তেমনি ও ছিল একজন নির্ভীক ঘোড়সওয়ার। তাছাড়া ও একজন প্রথমশ্রেণীর সাঁতারু। ছুতোরের কাজে, খোদাইয়ের কাজে,

চিত্রাংকনে সিদ্ধহস্ত ছিল ফাস্তোভ। লেখাপড়াতেও মন্দ ছিল না। তবে সব থেকে বেশি গুণ তার----কথা ও বলত খুব কমই। ছাত্রমহলে তর্কসভায় নিঃশব্দ হাসি আর নরম চাউনি দিয়েই ফাস্তোভ তার কাজ সারত।

মেয়েদের মহলে ওর আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারেও ও সিদ্ধজয়ী হতে চায়নি। সহজ হলেও অনেককে পেতে চায়নি মুঠোর মধ্যে। তাই বন্ধুরা বলত, 'ও আমাদের সাবধানী মৌমাছি। সব ফুলে মধু খায় না। তবু ওর ঔজ্জ্বল্য আমার চোখ ঝলসাতে পারেনি। চোখ ঝলসানোর মত কিছু ছিল না ওর মধ্যে। ওর ভালবাসা আমার কাছে ছিল খুব দামী। যখনই ডেকেছি আমি ও কখনো বিমুখ করেনি আমায়। ওর মত সুখী লোক পৃথিবীতে খুবই কম দেখা যায়। সহজ সাবলীল ঝরনাধারায় প্রবাহিত হত ওর প্রাণ। মা কি আত্মীয়স্বজন সবার প্রিয়পাত্র ছিল ফাস্তোভ। ওদের সমাজে বন্ধু আমার সব ভালবাসার উপলক্ষ্য হয়ে ছিল। সে আমার নিজেরও কম গৌরবের ছিল না।

॥ ৪ ॥

সেদিন একটু সকাল সকালই বন্ধুর বাড়ি গিয়ে হাজির হয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম পড়ার ঘরেই তাকে পাব। কিন্তু আমায় হতাশ হতে হল। আমার জুতোর আওয়াজ পেয়ে পাশের ঘর থেকে সাড়া দিল সে। সেখান থেকে জলের ছপছপানি আর জোর জোর হাঁপানোর আওয়াজ আসছিল। ভোরে উঠে ঠাণ্ডা জলে নাওয়া সেরে নেয় ফাস্তোভ। তারপর পুরো পনের মিনিট ব্যায়াম

করে। এই ওর নিয়মিত অভ্যাস। শরীরও গড়েছিল মজবুত করে। শরীর সম্বন্ধে খুব একটা ভাবনা দুশ্চিন্তা সে পছন্দ করত না বটে কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্যে যতটুকু যত্ন নেওয়া দরকার তা নিতে কসুর করত না। ওর মত ছিল অনেকটা এইরকম। অযত্ন কোরো না শরীরের। তবে তা নিয়ে ভেবে মিছিমিছি মাথা গরমও কোরো না। শরীর মনের মিতাচারটা খুব দরকার।

যে ঘরে আমি বসে ছিলাম তার বাইরের দিককার দরজাটা হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল। আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই নীল ইউনিফর্ম পরা একটি লোক ঘরে এসে ঢুকল। লোকটির বয়স হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। বলিষ্ঠ গড়ন। লম্বায় চওড়ায় মস্ত চেহারা। মুখের রং কালচে লাল। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চোখের সাদা রঙটা বিসদৃশ। মাথা ভর্তি ছাইরঙের কোঁকড়ানো চুল থরে থরে সাজানো। আমায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। তারপর মুখটা ঈষৎ ফাঁক করে কাঁসির আওয়াজের মত টঙাস করে একটা আওয়াজ করতেই সবকটি দাঁত বিকশিত হয়ে উঠল তার। তখুনি আবার পাছায় একটা সপাটে চাপড় মেরে এক পা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সমুখপানে ঝুঁকে দাঁড়াল লোকটা।

মাস্টার মশায় এলেন নাকি?—পাশের ঘর থেকে সাড়া দিল ফাস্তোভ।

অয়ম ভো—সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা হল সরবে। কাঁসির মত খন খন আওয়াজ গলায়। বললেন—ও ঘরে কি হচ্ছে এত বেলায়? এখনো তোমার সাজগোজ সারা হল না। বেশ বেশ। সেরে নাও। ছোকরাটিকে পড়াতে এলাম এ্যাদ্দুর ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে।

সে এদিকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসে আছে। কাজের মধ্যে শুধু বসে বসে হাঁচছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ। পড়ানো আজ বন্ধ। তাই ভাবলাম তোমার কাছে এসে গায়ে একটু তাত লাগিয়ে নিয়ে যাই।

তেমনি অদ্ভুত হাসিতে খন খন করে বেজে উঠল লোকটি। চটাশ করে পায়ে কয়েকটা চাপড় পড়ল আগের মত। তারপর পকেট থেকে বেরুল রঙীন সতরঞ্চ রুমাল। বিকট শব্দে নাক ঝাড়তেই চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে বেরিয়ে এল যেন। তারপর রুমালে নাক চেপে সমস্ত ফুসফুসটাকে ফুলিয়ে একটা নাদ তুললেন—হুঁ-হুঁ-ম।

ইতিমধ্যে ফাস্তোভ এসে পড়ল ঘরে। আমাদের দুজনকেই সম্ভাষণ করে পরিচয় হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে।

আরে ছো ছো। আমি হলাম গিয়ে বারো সালের লড়াই ফেরত লোক। ওঁর সঙ্গে এখনও পরিচয়ের সৌভাগ্যই হয়নি আমার। গম গম করে উত্তর দিল লোকটি।

ফাস্তোভ প্রথমে আমার পরিচয় দিল। তারপর আগন্তুক লোকটির পরিচয় দিয়ে বললে—আমাদের মাস্টার মশাই—প্রফেসর। বিষয়, মানে, ঠিক কোনো একটা নয়, নানা বিষয়েই শিক্ষা দেন।

ঠিক বলেছ।...হরেকরকম বিষয়।

যেন গানের মত সুর করে বললেন প্রফেসর—ভাবো দিকিনি, কোন্ বিষয়ে আমি ক্লাস নিইনে। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়াইনে। বা এখনো পড়াচ্ছিনা। অঙ্ক, ভূগোল, সংখ্যাবিজ্ঞান, বুককীপিং। হা-হা-হা—তাছাড়া গান। আপনার সন্দেহ হচ্ছে বুঝি—

হঠাৎ প্রফেসর যেন আমার উপর হামলে পড়লেন—আপনার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন—একটা বাঁশের বাঁশী আমার ঠোঁটে কি রকম মিহি সুর বার করে। একরকম ভবঘুরে বাউণ্ডুলে লোক আমি। চেক্, তাই বলতে পারেন আপনি। চেকই বটে আমি। আদত বাড়ি ছিল পুরানো প্রাহায়। যাক্ সে কথা, তোমায় যে বড়ো অনেকদিন দেখিনি ফাস্তোভ? দেখাশুনো ত মাঝে মাঝে হওয়া দরকার। নয় কি, বল?

পরশু দিনই ত আপনার বাসায় গিয়েছিলাম—উত্তরে বললে ফাস্তোভ।

আরে সে ত একযুগ হয়ে গেল।

লোকটি যখন হাসে ওর চোখের মনি দুটো শ্বেতসমুদ্রে এ-কোণ ও-কোণ পাড়ি দেয়।

আমার কথাবার্তা শুনে খুবই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ না হে ছোকরা—প্রফেসর আবার আমাকে নিয়ে পড়লেন। বললেন—আশ্চর্য লাগা খুবই স্বাভাবিক। তার কারণও আমি জানি। তুমি ত আর আমার মেজাজের সঙ্গে ঠিক পরিচিত নও। আমার কথা না হয় তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে নিও। সে বলবেখন আমার সম্বন্ধে সব কথা। আর নতুন কথা বলবেই বা কি? বলবে খুবই সাদা মাটা ভালমানুষ। জন্মকৌলিন্যে রাশিয়ান নয় বটে, তবে মনে-প্রাণে খাঁটি রাশিয়ান। মনে যা আসে মুখে তাই বলে দেয়। কোনো রাখঢাক নেই। আদবকায়দা আমি জানিও না—কারুর কাছে প্রত্যাশাও করিনে। আর বেশি ফরম্যালিটি দেখলেও গা জ্বালা করে আমার। আসবেন না একদিন সন্ধেবেলা আমার বাসায়। নিজেই দেখেশুনে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবেন। আমার

গিন্নীও খুব সাদাসিধে ভালোমানুষ। তারও নিজের সম্বন্ধে কোনো দম্ভ দেমাক নেই। নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে আপনাকে। রান্নায় চমৎকার হাত। তুমি কি বল ফাস্তোভ ? সত্যি বলছি না ?

শুনে মিষ্টি করে হাসলে ফাস্তোভ। কথা কইলে না। আমিও চুপচাপ রইলাম।

এ বুড়োকে হেয় জ্ঞান না করে একদিন আসবেন না আমার ওখানে। কিন্তু এখন—পকেট থেকে একটি চ্যাপটা রূপোর ঘড়ি বার করে চোখের কাছে ধরে বললেন প্রফেসর—এখন আমায় এগুতে হচ্ছে। আর একটি ছাত্র আমার আশাপথ চেয়ে আছে। ভগবান জানেন কি শেখাচ্ছি তাকে। পুরাণ কাহিনী। যাক্, অনেক দূরে থাকে সে ছোকরা। গুটি গুটি চলে যাব ঠিক। পড়ানোর হাত থেকে রেহাই দিয়ে তোমার ভাই আজ আমায় বাঁচিয়েছে। তা নইলে স্লেজে যাবার জন্যে পনের কপেক খসাতে হত পকেট থেকে। হা-হা-হা। শুভ দিন বন্ধু—আবার দেখা হবে। নিশ্চয়, কি বল। জুতোতে সশব্দে পা ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন প্রফেসর বারান্দা থেকে।

শেষ বারের মত তার তীক্ষ্ণ হাসি খন খন করে কানে এসে বাজতে লাগল। ফাস্তোভের দিকে বোকার মত তাকিয়ে আমি তার আসাযাওয়ার কথাটা ভাবতে লাগলাম।

॥ ৫ ॥

লোকটির অদ্ভুত ব্যবহারে অবাক না হয়ে উপায় ছিল না আমার। বন্ধুর দিকে চেয়ে বললাম আমি, আরো একটু স্পষ্ট করে বললাম—ভারী অদ্ভুত মানুষ তো ?

ফাস্তোভ ততক্ষণে ওর যন্ত্র নিয়ে বসে গেছে। তবু ওর কাছে আরো কিছু শুনতে পাব এই আশায় আমি আরো একটু স্পষ্ট করে বললাম—কি মনে হয় তোমার? লোকটা বিদেশী নাকি? এমন চমৎকার রাশিয়ান বলতে পারে মনে হয় খাঁটি রাশিয়ানই হবে হয়ত।

বিদেশী বই কি। ঠিক রাশিয়ান নয়। প্রায় বছর ত্রিশ রাশিয়ায় আছেন এই অবধি। সে অনেক দিনের কথা। রাজ-পরিবারের কেউ ওঁকে বাইরে থেকে এনেছিলেন তার একান্ত সচিব করে। হয়ত বা খাস খানসামা করে তাই বা কে বলতে পারে? তবে লোকটি চমৎকার।

যাই বল। কথাবার্তায় মহা ঘোর প্যাঁচ। একটা কথা কি সহজ করে বলতে জানে?

হবে—অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। রাশিয়াপ্রবাসী জার্মানদের ধরনই ঐ। ওরা সব ঐ এক ধাবার।

কিন্তু ও ত আর জার্মান নয়। মনে হয় চেক।

ঠিক জানি না। হয়ত বা তাই হবে। বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে জার্মানভাষায় কথা বলতে শুনেছি।

তবে নিজেকে বারো সালের লড়াই ফেরত বলে জাহির করে কেন বলত? মিলিটারীতে ছিল নাকি কোনোদিন?

মিলিটারী? মিলিটারীই বটে। মস্কোতে যখন আগুন লাগে তখন উনি এখানেই ছিলেন। বাড়ি ঘর সব জ্বলে পুড়ে গিয়েছিল। মানে সর্বস্বই খুইয়েছিলেন আর কি। ঐ অবধি জানি। মিলিটারীর কথা ত কখনো শুনিনি।

কিন্তু বিদেশী মানুষ। মস্কোর মাটি কামড়ে পড়ে থাকার মানে?

আমার সঙ্গে অবিশ্রান্ত কথা যতই বলুক, হাতের কামাই নেই ফাস্তোভের। নিজের কাজটুকুন সে ঠিকই করে যাচ্ছে নজর রেখে।

ভগবান জানেন। গুজব, উনি নাকি আমাদের পক্ষের গুপ্তচর ছিলেন। হয়ত সত্যি নয়। তবে এটা সত্যি যে সরকারের কাছ থেকে জ্বলেযাওয়া সম্পত্তির প্রচুর খেসারত পেয়েছিলেন।

গায়ে ত ইউনিফর্মের মত কি একটা পরে থাকে। মনে হয় কোনো সময়ে সরকারী চাকুরে ছিলেন বা আছেন এখনো।

শিক্ষানবিশদের শিক্ষক উনি। কাউন্সিলার জাতীয় কি একটা পদও আছে।

বাড়ির গিন্নীটি কেমন ধারা ?

গিন্নীটি জাতিতে জার্মান। এখানকারই স্থায়ী বাসিন্দে। বাবা কসাই না কি যেন ছিল।

মাস্টারের বাড়ি বুঝি হামেশাই যাতায়াত আছে ?

না, না। যাই মাঝে মাঝে। সময় সুযোগ পেলে এই আর কি—ভালো লাগলে—

ভালো লাগলে ? ভালো লাগার কিছু আছে বুঝি ?

অস্বীকার করব কেন ? ভালো লাগে বলেই যাই।

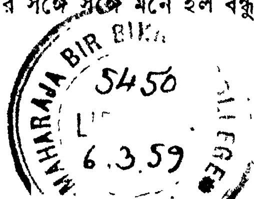
মাস্টারের ছেলেমেয়ে কটি ?

জার্মান বৌয়ের তিনটি আর প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে আর এক ছেলে।

বড় মেয়েটি ডাগর বুঝি।

তা প্রায় বছর পঁচিশ হবে।

মেয়েটির কথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল বন্ধুর আমার মাথাটা



অনেকটা ঝুঁকে পড়ল। যন্ত্রের চাকা হঠাৎ যেন আরো জোরে ঘুরতে লাগল। তার পায়ের চাপে আরো জোর শন্ শন্ করে আওয়াজ হতে লাগল।

মেয়েটি দেখতে কেমন? সুন্দরী?

ওটা রুচির ব্যাপার। তবে ওর মুখখানি অসাধারণ তা বলব। মেয়েটি অদ্ভুত। মানে সাধারণ মেয়েদের মত ঠিক—

হুঁ—মনে মনে বললাম আমি। বন্ধু যেন হঠাৎ বিশেষ একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করতে লাগল। আমার পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শোনা গেল তার গলা দিয়ে। অর্থাৎ মেয়েটির কথা আর আমার কাছে বেশি ভাঙতে চায় না ও।

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম আমি। তা হলেই সব রহস্য বোঝা যাবে।

॥ ৬ ॥

কদিন পরে আমরা দুই বন্ধুতে প্রফেসরের বাড়িতে পা বাড়ালাম। ইচ্ছেটা ছিল, ওদের বাড়িতে সন্ধ্যেবেলাটা গল্পে পরিচয়ে ভালই কাটাতে পারব। বুলেভার্দের ধারে বেশ একখানি কাঠের বাড়ি আমাদের প্রফেসরের। পিছন দিকে মস্ত জমি বাগান।

আমাদের আসতে দেখেই বারন্দা পেরিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি। মহা অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন আমাদের দুজনকে। সাড়ম্বরে সশব্দে। বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিলেন একটি মোটাসোটা মহিলার সঙ্গে। যেমন মোটা শরীর পরনেও তেমনি মোটা কাপড়ের গাউন। ইনিই এলিনা। প্রফেসরের সখা সচিব গৃহিণী।

এখন মেদে মাংসে বিপুলা হয়ে উঠেছেন বটে, তবে মানস-চক্ষে দেখতে পেলাম বেশ কিছু বছর আগে এই সর্বাঙ্গ জুড়ে ছিল নরম ফোটা ফুলের মত স্নিগ্ধ সজীবতা। রূপে বর্ণে গন্ধে সমারোহের অন্ত ছিল না। বসন্তের দিনে পথে চলা অনেক উদাসীন সেদিন হঠাৎ খুশি হয়ে চেয়েছে। চেয়ে আর সহজে মুখ ফেরাতে পারেনি। এরা ফুলের হাটে হারিয়ে যাবার নয়। কি একটা জিনিসের জন্যে এই সব জাতের মেয়েদের বড়ো পছন্দ করে ফরাসীরা। জিনিসটা কি ঠিক মনে পড়ল না তখন।

কিন্তু কথা কয়ে খুবই নিরাশ হলাম। ফুলের উপমাটা বৃথাই মনে হল। বাইরের উষ্ণ চেহারার মত ভেতরটাতেও কোথাও সরস নবীনতা নেই। তবে প্রয়োজনীয়তার কথা তুললে খুবই দামী মনে হল। কেন সেই কথাই বলছি। প্রথমেই যে জিনিসটা চোখে পড়ল আমার সে হল তার পরিচ্ছন্নতা। শুধু নিজের চারি-পাশেই না—ঘর গৃহস্থলীর যতটুকু চোখে পডল কোথাও এতটুকু মলিনতা দেখলাম না। জিনিসপত্র পোশাক পরিচ্ছদ সবই সাদাসিদে। ঐশ্বর্য বিলাসের কোনো উপকরণ নেই। কিন্তু সব কিছুই যেন ঝক ঝক করছে। আলো ঠিকরে পড়ছে চারিদিকে। থালা বাসনগুলো ত আলো লেগে সোনার আলোয় জ্বলছে মনে হল। প্রফেসরের চারটি ছেলেমেয়ে বসে ছিল মায়ের আশে পাশে। মায়ের মতই গোলগাল চেহারা তাদের। মোটা বেঁটে বেঁটে আঙুল। কপালের ওপর একটি করে কোঁকড়ানো চুলের গুছি যত্ন করে বসানো।

একটি একটি করে ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত দিয়ে দিয়ে প্রফেসর বললেন—দেখছ ত,—এই আমার পল্টন। কেলিয়া,

মলগা, সামকা আর মাসকা। এইটে আটে পড়েছে। এটির সাত হবে এবার। এটি চারে পা দিয়েছে। আর এইটি হল কোলের। সবে দুই চলছে। দেখছ ত ছোকরারা। আমাদের দুই মানুষের কাছে কাজের ফাঁকি পাবে না। কি বল গো গিন্নী—ঠিক কি না।

কি যে পাগলের মত কথা বলো? ওদের কাছে ওসব কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না—বেশ রাগ করে বললেন প্রফেসর গিন্নী। তারপর মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন।

সব কটার নাম দিয়েছি খাঁটি রাশিয়ান। এর পর আর একটি কাজ ওর বাকী আছে। গোঁড়া রক্ষণশীল মতে ওদের ব্যাপটাইজ করে দিলেই ওদের মায়ের কাজ সারা হয়। তোমরা জানো না, জাতে জার্মান হলে কি হয়, ওর মন ভারী প্রাচীনপন্থী। হ্যাঁগো ধর্মের ব্যাপারে তুমি ভারী গোঁড়া মেয়ে মানুষ নও?

আর দেখে কে। বাঘিনীর মত ক্রোধে আত্মহারা হলেন, প্রফেসরগৃহিণী।

আমি হলাম গিয়ে রাশিয়ান কাউন্সিলারের বিয়ে করা বৌ। সেকথা খবরদার ভুলো না তুমি। তোমার যা মুখে আসে তাই বলতে পার। জন্ম আমার যেখানেই হোক, রাশিয়ান হতে আমার পুরো অধিকার জন্মেছে।

দেখলে ত? আর সত্যি কি ভালোবাসাটাই না ভালবাসে ও রাশিয়াকে। রাশিয়ার কোনো কিছুর নিন্দা সইতে পারে না। একেবারে চাপা আগুনের মত ফেটে পড়ে।

তাতে দোষটা হয়েছে কি? কি দোষটা হয়েছে শুনি? —গৃহিণীও সমান গর্জাতে থাকেন—রাশিয়াকে ভালবাসব না। এদেশ ছাড়া আর কোন্ হতচ্ছাড়া দেশে এত বড়ো সম্মান প্রতিপত্তি

পেতাম আমি, কথাটা কি দয়া করে বলবে ? আর শুধু আমি ! আমার কল্যাণে এইসব ছেলেমেয়েরা অবধি নীলরক্তের অধিকারী হয়েছে। সেটা কম লাভ ভাব ?

হাত নেড়ে তাকে নিরস্ত করতে চাইলেন প্রফেসর। বললেন—ক্ষান্ত দাও মহারানী। অতখানি বিচলিত হওয়া তোমার সাজে না। সে কোথায় ? তোমার নীল রক্তের উত্তরাধিকারী ছেলে ভিক্টর। কোথায় টহল মেরে বেড়াচ্ছে সে ? একদিন পড়বে পুলিসের হাতে। সেই ওকে জীবনের মত শিক্ষা দিয়ে দেবে। তা হবে না ? এমন বড় ঘরের শিক্ষা—

সে ভয় তোমার করতে হবে না। ছেলের নিন্দা বুকে বাজতেই তিনি ফোঁস করে উঠলেন প্রফেসরের ওপর।

বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম তা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। ফাস্তোভের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। প্রশ্ন করতে চাইলাম এই ধরনের লোকদের সংসারে কিসের লোভে তুমি আস যাও বন্ধু। কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টি মূকই রয়ে গেল, মুখর হল না।
ঠিক সেই মুহূর্তে একটি দীর্ঘছন্দা মেয়ে কালো পোশাকের ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াল। বুঝলাম এইটিই প্রফেসরের বড়ো মেয়ে। এর কথাই ফাস্তোভ অনেকবার করে বলেছে আমায়।

তাকে দেখে রহস্যটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এ বাড়িতে কিসের লোভে বন্ধু আমার নিত্য অতিথি তা বুঝতে আমার বাকী রইল না।

॥ ৭ ॥

সেক্সপীয়রই সম্ভবত। তিনিই কোনো এক জায়গায় কালো কাকেদের দলে এক দুধসাদা পায়রার কথা উল্লেখ করে কি একটা উপমা দিয়েছিলেন।

যে ডাগর মেয়েটি সেই মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকল তাকে দেখেই মহাকবি সেক্সপীয়রের সেই অনিন্দ্য উপমাটি আমার মনে পড়ে গেল। তার চারিপাশ ঘিরে যে জগৎ সংসার তার সঙ্গে কোনো মিল নেই সে মেয়ের। সে যেন এক বনান্তের হরিণী হঠাৎ এসে পড়েছে এই ভেড়াদের দলে। এই পরদেশী ভিন্নগোত্রদের গোষ্ঠীতে এসে সেও যেন কেমন হতচকিত হয়ে গেছে। তারই বিভ্রান্তি সর্বক্ষণ মুখে চোখে লেগে রয়েছে।

এ বাড়ির আর কটি ছেলেমেয়ে কেমন হাসিখুশি। প্রফেসর ও তার গিন্নীর মধ্যে যতই কলহ বিবাদ থাক তাদের মনে কোথাও কোনো দুঃখ বেদনার চিহ্ন নেই। একটি গোটা সুখী পরিবারের মধ্যে এ যেন একটি ব্যতিক্রম। এই হাসি আনন্দ উৎসবের মধ্যে ঐ অপরূপা মেয়েটি এক গা রূপ নিয়ে যেন একটি বিশুষ্ক প্রাণপদ্মের মত অলস আবেশে এলিয়ে রয়েছে। আপন বৃন্তে ম্রিয়মান যেন একটি সূর্যবঞ্চিত সূর্যমুখী। আশার আলো নেই চোখের গভীরে।

এ বাড়ির আর সবাই কেমন যেন সাদামাটা আটপৌরে। যেমন চেহারায় তেমনি সাজপোশাকে রুচিতে। কিন্তু এই মেয়েটির ভিতরে বাইরে এমন একটা বনেদীয়ানা আছে যা ভিড়ের মধ্যেও একে আলাদা করে রাখে। জার্মান বলতে যে-সব বিশিষ্টতা আমাদের মনে আসে তার কোনোটাই নেই এদের চলনে বলনে। মনে হয়

ওর তরুণ রক্তে আরো দক্ষিণ দেশের রং মাখানো। ওর নবীন দেহে দক্ষিণা মাটির গন্ধ।

অমন ভ্রমরকালো চিক্কণ চুলের পরিপাটি, অমন কালো চোখের গভীর রহস্য, ঐ রকম চাপা কপাল, ঐ টানা বাঁশীর মত নাক, গায়ের ঐ রকম নরম নরম রঙ, পাতলা ঠোঁটের কোণে একটি মাত্র বেদনার রেখা—সব মিলে মুখের যে স্নিগ্ধ সরস মাধুরী তা ইতালীতে দেখলে মোটেই অবাক হতাম না আমি। কিন্তু মস্কোর এই অনভিজাত পাড়ায় ঐ চোখ মুখ ভুরু কপাল দেখে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলাম তা বলতে বাধা নেই।

মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকতেই আমি সম্ভ্রম ভরে উঠে দাঁড়ালাম। তার ডাগর চোখের একটি ত্রস্ত হরিণী দৃষ্টি হেনে মেয়েটি চোখ নামিয়ে নিলে। দীর্ঘ ভোমরাগুলির ছায়া পড়ল দুই পাশে। চকিতের মধ্যেও এসব আমার দৃষ্টি এড়ালো না। ততক্ষণে মেয়েটি জানলার কাছে বসে পড়েছে। একেবারে আলাদা হয়ে বসেছে। ভিড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে।

ফাস্তোভের দিকে এতক্ষণে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু তার মুখখানি দেখতে পেলাম না। প্রফেসরগিন্নীর হাত থেকে এক কাপ স্নেহভরা চা নিয়ে আমার দিকে পিছন করে সে তখন পরম আনন্দে নিজেকে পরিতৃপ্ত করতে ব্যস্ত।

মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকতেই যেন এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছেয়ে গেল ঘর। আর তেমন অন্তরঙ্গ আলাপ জমতে চাইল না যেন।

পুতুল না প্রতিমা। কি ও? মনে মনে ভাবলাম আমি। কিন্তু মনের ভিতর কোনো উত্তর পেলাম না।

॥ ৮ ॥

আমার দিকে চেয়ে যেন হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন প্রফেসর। বললেন—এস তোমার সঙ্গে পরিচয়টা সেরে দি। এই আমার—মানে আমার পয়লা নম্বর আর কি—সুসানা আইভানোভনা।

মৌনমুখেই আমি অভিবাদন করলাম। আর সেই সঙ্গেই আমার মনে হল যে এ নামটারও এদের পারিবারিক উপাধির সঙ্গে কোনো মিল নেই। কিন্তু কেন তা তখনো বোঝবার সময় আসেনি আমার।

ঈষৎ নড়ে বসে সুসানা আমার সৌজন্যের প্রত্যুত্তর দিলে। ভদ্রতা করে না একটু হাসলে, না যুক্তপাণি মুক্ত করে আমার দিকে একখানি হাত বাড়ালে।

তারপর—ফাস্তোভের দিকে চেয়ে প্রফেসর বললেন—তারপর বন্ধু। এখন কি করা যায়? তোমার যন্ত্রটা ত আমার কাছেই পড়ে রয়েছে। এসো না আজ একটু আনন্দ করা যাক। দুজনে মিলে যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে এদের একটু খুশি করে দেওয়া যাক্।

মানুষটি যে গান বাজনার বড়ো গুণী সেটি দেখাবার লোভ তার ভয়ানক। বিশেষ করে রাশিয়ান সুরের ওপরই যেন তার বত্রিশ নাড়ীর টান। কেউ কিছু বাজাতে বললেই উনি অমনি সঙ্গত করার জন্য তৈরী।

ফাস্তোভ কোনো আপত্তি করলে না দেখে প্রফেসর মহা খুশি হয়ে উঠলেন। তখনি সারা ঘরে সাড়া পড়ে গেল। প্রফেসর দশ দিকে দশ হুকুম ছড়িয়ে দিলেন।

কোলকা মা, তুমি যাও পড়ার ঘরে গিয়ে পিয়ানোর কাছে বসে পড়। ওলগা তুমি ফাস্তোভের যন্ত্রটা নিয়ে এস। বেশ যন্ত্র

করে নিয়ে এস। তোমাকে নিয়ে আর আমি পারি না। যাও না, তু একটা বাতি জেলে দাও না তুমি। একটি পরিপাটি আবহাওয়া করে দাও জলসার জন্যে।

সারা ঘরে যেন লাট্টুর মত ঘুরতে লাগলেন তিনি।

আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—তুমিও নিশ্চয় গান বাজনা খুব ভালবাস। আর যদি একান্তই না ভালো লাগে গল্পসল্প করতে পার। কিন্তু হুঁস থাকে যেন চেঁচিয়ে কথাবার্তা নয়। ফিসফিস করে কথা কইবে। তোমাদের ফিসফিস গুজ গুজ যেন কারুর কানে না যায়। কিন্তু সে ছোঁড়াটা কোথায় গেল গো? ঐ যে তোমার বড়ো ঘরের বংশধর। আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই তার মাথাটি খেয়ে ফেলেছ এলিনা।

ছেলের কথায় বোমার মত ফেটে পড়লেন প্রফেসরগিন্নী।

মুখ সামলে কথা বলবে বলে দিলাম। নইলে একদিন মহা অনর্থ হবে। বাপ হয়ে নিজের ছেলের এমন নিন্দে করতে পার কি করে, আমি ত ভেবেই পাই না।

থাক, থাক। আর মাথা গরম করতে হবে না। আমি কেথাকার কে? এক টেরে পড়ে আছি। সর্বদাই তোমাদের মা বেটার দেনায়—

ততক্ষণে বাড়ির সব ব্যবস্থা সারা হয়ে গেছে প্রফেসরের হুকুম মত। সুতরাং বাজনা শুরু হতে দেরী হল না।

তোমাকে ত বলেছি যে গান বাজনায় ফাস্তোভ কারো চেয়ে কম গুণী ছিল না। তবু তার হাতে ঐ যন্ত্রটা আমার মোটেই ভাল লাগত না। এমন একটা নাকী সুর বেরোয় ঐ যন্ত্র থেকে আর এমন বিকট খনখনে আওয়াজ যে মনে হয় যেন কোনো নিরীহ ভদ্রলোকের

কাছ থেকে পাওনা টাকার তাগাদা করছে রক্তচোষা ইহুদী পাওনাদার। আর প্রফেসরের ত কথাই নেই। তিনি যে-ভাবে বাজনাটা বাগিয়ে ধরেছেন মনে হচ্ছে এখুনি কারো মাথায় বসিয়ে দিয়ে একটা খুন খারাবি করে বসবেন। বাজাতে বাজাতে মুখখানা রাঙা হতে হতে কালচে হয়ে উঠছে। গলা দিয়ে একটা খস খস আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। যেন দাঁতে পিষে কাকে গোল্লায় যেতে বলছেন প্রফেসর। আর যা বেরোচ্ছে যন্ত্র দিয়ে, তাকে সুর না বলে অসুর বলাই বোধ করি ভাল বর্ণনা।

বিপদ বুঝে আমি সরে গিয়ে সুসানার কাছে বসলাম। একটু বিরতির সুযোগ খুঁজে কথা পাড়ার চেষ্টায় রইলাম।

সুযোগ আসতেও দেরী হল না। ফিসফিস করে বললাম তাকে—

গান বাজনা খুব ভালবাসেন বুঝি বাবার মতই।

চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিলে সুসানা। কাটা গলায় জবাব দিলে। বললে—কে বাবা?

আপনার বাবা। মানে প্রফেসর—

প্রফেসর আমার কোনো কালে বাবা নন।

সে কি? বাবা নন। তাহলে মাপ করবেন আমায়। সব জিনিসটাতে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে প্রফেসর একদিন বলেছিলেন—

এতক্ষণে আমার দিকে আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টিপ্রদীপ তুলে ধরে চাইলে সুসানা। লজ্জিত কণ্ঠে বললে—আমায় ভুল বুঝবেন না। প্রফেসর হলেন আমার মায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী।

আমার মুখে আর কথা জোগালো না অনেকক্ষণ। চুপ করেই বসে রইলাম। তারপর নতুন করে আলাপের সূত্রপাত করলাম।

বললাম—গান বুঝি ভাল লাগে না আপনার ?

আর একবার সেই কালো চোখের মুক্ত চাহনি দেখলাম আমি। সুসানার চোখ দুটি যেন বনহরিণীর চকিত ভীরু নয়ন। এ সংসারের বন্দীশালায় যে-চোখে আজও পোষমানার চিহ্নমাত্র নেই।

আমার এই অহেতুকী আত্মীয়তার ভঙ্গিতে সে যে অন্তরে অন্তরে খুশি হয়নি তা তার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম আমি।

সে কথা ত আমি একবারও বলিনি। যেন কত ক্লান্ত ধীরকণ্ঠে বললে সে।

ততক্ষণে যন্ত্রসংগীতের সুবাসুবদের মরণদশা উপস্থিত। ককিয়ে হাঁপিয়ে ঘরঘর করে নাভিশ্বাস ওঠবার যোগাড়। প্রফেসরের লালচে মোটা ঘাড়টা ময়াল সাপের শরীরের মত ফুলে উঠেছে। দেখে এমন ঘেন্না করতে লাগল আমার।

কিন্তু ঐ—মানে ঐ যন্ত্রটাতেই বোধ হয় আপনার রুচি নেই ? কি বলেন তাই না ?

আমার গোপন ইঙ্গিতটুকু বুঝে নিতে দেরী হল না বুদ্ধিমতীর। তেমনি ফিসফিস করে বললে—ঠিকই ধরেছেন। মোটেই আমার রুচি নেই এসব জিনিসে।

ওঃ—সুসানার মুখের কথা শুনে কি জানি কেন আমার বুক থেকে একটা পাষাণ নেমে গেল। আনন্দেই যেন সারা দিয়ে ফেললাম।

এমন সময় প্রফেসরগিন্নী সকলকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—তোমরা জানো না বোধ হয় আমার সুসানা নিজে ভারী গুণী। গান বাজনা ও বড্ডো ভালবাসে। আর বাজনায় ওর হাত ভারী

চমৎকার মিষ্টি। অবশ্য শুধু শুকনো অনুরোধ পেলেই যে মানী মেয়ে আমার পিয়নোয় বসতে রাজী হবে, তা ভেবো না।

একথাতেও সুসানা সাড়া দিলে না। প্রফেসরের স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকালে না। শুধু তার চোখের পাতা ঈষৎ কেঁপে উঠল, সেইটুকুই আমি দেখতে পেলাম।

তার সেই অর্ধস্ফুট নয়নভঙ্গিতেই আমার বুঝতে বাকী রইল না যে প্রফেসরের এই স্ত্রীর প্রতি সুসানার ভক্তিপ্রীতির বহর কতখানি। দেখে আমার তৃপ্তির অবধি রইল না।

ততক্ষণে যন্ত্রসংগীত শেষ হয়ে গেছে। ফাস্তোভ যন্ত্র রেখে জানালার কাছে আমার দিকে এগিয়ে এল। যেন কত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে সুসানাকে জিজ্ঞেসা করলে পিটার্সবার্গ থেকে গানের স্বরলিপি পেয়েছে কিনা।

এই যে তোমাদের স্বর চয়নিকা—আমার দিকে ফিরে ফাস্তোভ বুঝিয়ে বললে—নতুন থিয়েটারে যে সব সুর নিয়ে তোমারা মহা হুলস্থুল করছ সেইসব গানের স্বরলিপিই আমি সুসানার জন্যে আনতে পাঠিয়েছি।

এখনো পাইনি—বলে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সুসানা। মৃদুকণ্ঠে বললে—আপনাকে মিনতি করছি আজ আমাকে পিয়ানোতে বসতে বলবেন না। আজ একদম মন নেই আমার বাজাবার। আজকের দিনটা আমায় মাপ করবেন আপনারা।

প্রফেসর আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুজনের কথাই কানে গিয়েছিল তার। শুনে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, বললেন—

চমৎকার। চমৎকার। নতুন থিয়েটারের স্বরলিপি যা বেরিয়েছে অমন আর দ্বিতীয়টি হয় না। হবে না? ইহুদী যে।

চেকদের মত ইহুদীরাও জাত গুণী যে, ইহুদীদের ঘরাণাই আলাদা। আমি ঠিক বলিনি সুসানা? ঠিক বলিনি, বল? বাউণ্ডুলে ইহুদীদের মতে—হাঃ হাঃ হাঃ—

প্রফেসরের বক্তব্যের শেষ কথাগুলি শুনে যেটুকু বুঝতে বাকী ছিল তার অট্টহাসি শুনে সেটুকু নির্মূল হয়ে গেল। হাতের বন্দী শত্রুকে লোকে যত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে অসংকোচে অপমান করে আনন্দ পায়, তার সব কটি লক্ষণই তার হাসিতে কথায় সশব্দে প্রকাশ পেল। অন্তত আমার ত তাই মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে।

প্রফেসরের কথার নোংরা ইঙ্গিতটুকু বুঝতে সুসানার মত বুদ্ধিমতী মেয়েরও বাকী থাকেনি নিশ্চযই। দেখলাম কিনা হঠাৎ বেতসপত্রের মত কেঁপে উঠল তার সারাদেহ। মুখখানি অপমানের আগুনে রাঙা হয়ে উঠল। পাতলা ঠোঁটখানি দাঁত দিয়ে কামড়ে যেন রক্তাক্ত করতে চাইলে অপমানিতা মেয়ে।

চোখের কোলে এক ফোঁটা জল উথল হয়ে উঠতেই, আনত মুখে উঠে দাঁড়াল সুসানা। তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে গেল।

তার অপস্রিয়মান মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন প্রফেসর—চললে কোথায় গো অভিমানিনী মেয়ে।

ওকে আর ঘাঁটিও না—প্রফেসরগিন্নী মাঝপথে থামিয়ে দিলেন স্বামীকে। বললেন—ওকে আর ঘাঁটিও না তুমি। জানই ত ও মেয়ের খেয়াল খুশির কোনো ঠিক ঠিকানা নেই।

মেয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে এক পাক ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। তারপর কোমরে চাপড় মেরে বললেন একেবারে নার্ভাস রুগী বলতে যা ঠিক তাই। ওর শরীরের স্নায়ু গ্রন্থির কিছু কিছু সবসময় জট পাকিয়ে থাকে কিনা। অবাক হচ্ছ তুমি, না? তারপর

পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বললেন—খুব অবাক হচ্ছ তুমি, না? শরীরতত্ত্ব নিয়ে আমিও কিছু পড়াশুনা করেছিলাম। ওসব রোগের কারণ লক্ষণ জানতে আমার আর কিছু বাকী নেই। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করো না। আমার স্ত্রীকে। ওর অধিকাংশ মেয়েলী অসুখ আমিই সারিয়ে দিই কিনা। মেয়েদের ব্যাপারে আমায় বলতে পারো ধন্বন্তরী।

তুমি সব সময় রসিকতা করো কেন বলত? স্বামীর এইসব ঘরোয়া কথাবার্তায় কপট ক্রোধের ভান করেন প্রফেসরগিন্নী। এই সব কাঁচা বয়সেব ছেলেদের কাছে কখনো মেয়েদের ওসব কথা বলতে আছে—

ফাস্তোভ এদের ঘরের ছেলে। স্বামী স্ত্রীর এই কপট কলহ সে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে। দেখলাম কিনা, শুনে সারা শরীর দুলিয়ে সে পরমানন্দে হাসতে লাগল।

পরিহাস করতে দোষ কি গো শ্রীমতী? প্রফেসরের গলায় জীবনদর্শনের তত্ত্ব শোনবার জন্যে তৈরী হয়ে উঠি আমি। বললেন—আনন্দ পরিহাস করব না? জীবনটা ত ভোগের জন্যেই পেয়েছি গো। রূপ সৌন্দর্য ভোগ করবার জন্যে। বড়ো বড়ো কবিরা ত বলেই গেছেন, জীবনের মধু করো পান। আঃ কোলকা, নাকটা মুছে ফেল দিকিনি। কি যে নোংরা হয়ে থাকিস দিন রাত।

॥ ৯ ॥

তোমার জন্যে আজকে বড়ো লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলাম।

সেইদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে আমি বললাম ফাস্তোভকে। তুমি বলেছিলে মেয়েটি—কি যেন নাম মেয়েটির—সুসানা। তুমি

বলেছিলে না যে সুসানা প্রফেসরের মেয়ে। কিন্তু ও ত প্রফেসরের নিজের মেয়ে নয়। ওর আগের পক্ষের স্ত্রীর সন্তান—

তাই নাকি? সুসানা ওর এ পক্ষের মেয়ে একথা বলেছিলাম নাকি? তা হোক, কথা ঐ একই দাঁড়াল ত। প্রফেসরেরই ত মেয়ে।

তোমার ঐ প্রফেসর। ঐ প্রফেসর লোকটিকে আমার মোটেই ভাল লাগল না। লক্ষ্য করেছিলে, মেয়ের সামনে ইহুদীদের সম্বন্ধে কি রকম নাক সিঁটকে কথা বলছিলেন? সুসানা—মানে মেয়েটির মা বুঝি জাতে ইহুদী ছিলেন?

পরমানন্দে ফাস্তোভ হাত দোলাতে দোলাতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। আজ দিব্যি ঠাণ্ডা পড়েছে। পায়ের নিচে গুঁড়ি গুঁড়ি নুনের মত তুষার জমেছে।

যতদূর মনে পড়ছে ঐ ধরনের একটা কথা শুনেছিলাম বটে—শেষপর্যন্ত মুখ খুলল সে। বললে, ওর মায়ের শরীরে ইহুদী রক্তই যেন ছিল শুনেছি।

তাহলে তোমাদের প্রফেসর প্রথমপক্ষে একটি বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন।

খুব সম্ভবত তাই।

হু। তাহলে ভিক্টরও ওর সৎ ছেলে?

না, না ভিক্টর ওর নিজের ছেলে। তুমি ত জান আমি কারুর ঘরের খবরে মাথা গলাই না। ওসব কথা জিজ্ঞাসা করার কোনো মানে নেই। অত কৌতুহল নেই আমার।

আমি ঠোঁট কামড়াতে লাগলাম। ফাস্তোভ তেমনিভাবে পিছনে মুখ না ফিরিয়ে সোজা এগিয়ে চলেছে সামনে। বাড়ির কাছ

বরাবর এলে আমি আবার ওর নাগাল ধরলাম। একবার আড়চোখে তাকালাম ওর মুখের দিকে।

সুসানা মেয়েটি সত্যিই ভাল গান বাজনা জানে? কি বল?

এতক্ষণে বন্ধুর আমার ভুরু দুটি ভ্রূকুটিতে পিঙ্গল হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত পিষে বললে—পিয়ানোতে ওর হাত ভালই। তবে ভারী লাজুক মেয়ে ও সে বিষয়ে আগেই তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি।

শেষ কথাগুলো দারুণ অপ্রসন্ন কটু কণ্ঠে বললে ফাস্তোভ। মনে হল আমার সঙ্গে সুসানার পরিচয় করিয়ে দিয়ে ও ভারী বিপদে পড়ে গেছে। ওর ভালবাসার পাত্রীটির উপর আমার এতখানি দরদ দেখে আমার ওপর রীতিমত অপ্রসন্ন হয়েছে সে মনে মনে। ওর মনের অবস্থা বুঝে আমি আর কথা না বাড়িয়ে সে যাত্রা নিঃশব্দে বিদায় নিলাম।

॥ ১০ ॥

কিন্তু আমার হাত থেকে ফাস্তোভ নিষ্কৃতি পেলো না।

পরের দিন সকালে উঠেই আমি তার বাড়ি মুখো রওনা হলাম। সকাল বেলাটা ওর ঘরে গল্পগুজব করে কাটানো যেন আমার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

রোজকার মত আজও ফাস্তোভ আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু গত সন্ধ্যার ব্যাপার নিয়ে একটি কথাও মুখ দিয়ে বার করলে না সে। সেসব কথা পরিপাটি হজম করে ফেলেছে ফাস্তোভ। সেইরকম যেন মনে হল আমার। আমিও সহজে কথা পাড়লাম না। নিঃশব্দে বসে দুরবীণ পত্রিকার সন্তপ্রকাশিত সংখ্যাটির পাতা উল্টাতে লাগলাম। পড়তে লাগলাম, সে-কথা

অবশ্য হলফ করে বলতে পারব না।

এমন সময় আমার অপরিচিত একটি ছোকরা ঘরে এসে ঢুকল। শুনলাম সেই ভিক্টর। আমাদের প্রফেসরের গুণধর বংশপ্রদীপ। গতকাল সন্ধ্যার জলসায় এই ছেলেটি না থাকায় প্রফেসরের অনু-যোগের আর অবধি ছিল না।

চেয়ে দেখলাম, ছেলেটির বয়স হবে আঠারো। পাতলা পাণ্ডুর চেহারা। কেমন যেন একটা রুগ্ন রুগ্ন ভাব শরীরে। দাড়িভর্তি মুখে উদ্ধত শ্লেষের বক্র হাসি। ফোলা ফোলা দুই চোখে বিষণ্ণতা আর ক্লান্তি। ছেলের মুখে বাপের মুখের আদলটি বসানো। পার্থক্য শুধু আয়তনে। ছেলেটির নাক চোখ ঠোঁট কপাল সবই কেমন একটু ছোট ছোট। তবে একটু লাবণ্য ছোঁয়ানো। কিন্তু ওর ঐ রূপের মধ্যেই কি একটু কুশ্রীতা আছে যার দিকে তাকালে মন কেমন অপ্রসন্নতায় ভরে ওঠে। ছেলেটির পরনের সাজপোশাক আদ্যোপান্ত নোঙরা। কোটের বোতাম নেই। বুটের এক পাটিতে ছ্যাঁদা হয়ে গেছে। সারা গায়ে সস্তা বাজে তামাকের বোটকা ঝাঁঝ।

কি খবর। আছেন কেমন।

একরকমের উদ্ধত বকাটে ছোকরা থাকে যারা মাথা কাঁধ বাঁকিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা কয়, ভিক্টরও তেমনি করে কথা কইল। বললে—

ভেবেছিলাম ইউনিভার্সিটিতে যাব। কিন্তু এসে গেলাম আপনার ডেরায়। বুকের ভেতর কেমন ব্যথা করছে। দেখি, একটা চুরুট ছাড়ুন ত ?

হাত দুটো প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে মুহূর্তকাল ঘরের মাঝখানে

স্থির হয়ে দাঁড়াল ভিক্টর। তারপর এসে সোফার উপর ধপাস করে বসে পড়ল।

ঠাণ্ডা লেগেছে বুঝি?—প্রশ্ন করলে ফাস্তোভ। আর সেই সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিলে। আমরা দুজনেই ছাত্র। তবে ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাকল্‌টিতে পড়ি।

না ঠিক ঠাণ্ডা নয়। কি জানি, হয়ত বা তাই হবে। রাত্রে—বলে ছেলেটি একটু হাসলে। আর সেই হাসির সঙ্গে দুপাটি অপরিচ্ছন্ন দাঁতের সারি দেখালে।

কাল বেদম মাতাল হয়ে পড়েছিলাম—চুরুট ধরিয়ে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলে সে। তারপর বললে—আপনাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলল যে। বিদায় ভোজে হাজিরা দিতে গিয়েছিলাম কিনা।

কোথায় গেল?

ককেসাসে। ডাগর বৌটিকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। সেই মেয়েটাকে মনে পড়ছে? টানা টানা দুটো চোখের কালোয় ডুব দিয়ে মরতে চাইত ছোকরারা। আঃ সেই মেয়েটাকে ও কোলের বৌ করে পেয়েছে।

তোমার বাবা কাল তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

ভিক্টর এক পাশে থু করে থুথু ফেললে। অবহেলা ভরে বললে, শুনেছি। আপনারা ত কাল গিয়েছিলেন আমাদের ডেরায়। গান বাজনা হল ত?

ঐ যেরকম হয় আর কি।

আর সেই মেয়েটা? আমার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে কি একটা অশ্লীল ভঙ্গি করলে ভিক্টর। বললে, নতুন ছোকরা দেখে খুব

বাজার গরম করলে ত ? না, বাজাব না। বললে ত ?

কার কথা বলছ তুমি ?

কেন মহারানী সুসানা ছিল না ঘরে ?

বাহুতে মাথা রেখে বেশ আরাম করে বসল ভিক্টর। তারপর দুবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলে। ফাস্তোভের দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। দেখে সে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিলে যে আমার মত অর্বাচীন বেরসিকের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে তার লাভ নেই।

॥ ১১ ॥

ছাতের কড়ি বরগার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল ভিক্টর।

তারপর তার মুখে কথার খই ফুটতে লাগল। টেনে টেনে নাকী সুরে কথা কয় ভিক্টর। তার কথার মধ্যে আদ্যোপান্ত কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐটুকু সময়ের মধ্যে কত বিষয়ের অবতারণাই না করলে সে।

থিয়েটারের নিত্য খদ্দের সে। দু'জন নামজাদা অভিনেতার সঙ্গে তার প্রাণের দোস্তি। কলেজে এক প্রফেসর এসেছেন নতুন। তার কথা বলতে ভিক্টরের লজ্জার শেষ রইল না। লোকটা নাকি একেবারে মেঠো।

বুঝে দেখুন দিকি, বললে ভিক্টর, কি সব আজগুবি কায়দা ওদের। এসেই হাজিরা খাতা ধরে ছেলেদের নাম ডাকবে। কে আছে কে নেই—তাতে তোমার দরকার কি বাপু। তুমি পড়াতে এসেছ পড়িয়ে যাও। ওসব বায়নাক্কা করবার মানে ? আর ঐ প্রফেসরকে ছেলেরা নাকি ভালমানুষ বলে। অমন ভাল মানুষের

নিকুচি করেছে। ঐসব সবজান্তা জানোয়ারদের জেলে পুরে ফেলা দরকার।

বলতে বলতে ফাস্তোভের দিকে বেশ করে ঘুরে বসল ভিক্টর। যেন কত লজ্জিত বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে—আপনাকে একটা কথা বলছিলাম। মানে বাবাকে আপনি একটু বলতে পারেন ত আমার হয়ে। আপনার সঙ্গে দহরম মহরম রয়েছে। গান বাজনা চলে। দেখুন দিকিনি মাস গেলে পঁচিশটি মুদ্রা—ওতে কোনো ভদ্রলোকের চলে।

যেন লজ্জায় বেদনায় বিগলিত হয়ে পড়ল ভিক্টর। বললে—চলে বলুন আপনি? কি হয় ওতে? তোমাদের খরচ কুলিয়ে ওঠে না। আমার মত অবস্থায় পড়লে বাছাধন বুঝতে পারত চলে কি না চলে। আমার কি আর ঐভাবে চলে। আমার সব বড়ো বড়ো জায়গায় মিশতে হয়—আমি ত আর ঐ ওদের মত পেন্সনের ভরসায় থাকতে পারি না যে গিয়ে হাত পাতব।

ফাস্তোভের বিরস মুখখানির দিকে চাইলে ভিক্টর। তাকে যেন আশ্বাস দেবার জন্যেই বললে—তাই বলে ভাববেন না প্রফেসরের হাত শুকনো। আক্রাগণ্ডার দিন পড়েছে—ওসব বুজরুকি আমার কাছে চলবে না। কিছু ভয় নেই আপনার। রীতিমত ক্যাশ জমিয়েছে হাতে। বেশ মোটামুটিই জমিয়েছে বলে দিলাম।

একটু বিব্রত বোধ করেই ফাস্তোভ তাকাল তার দিকে। তুমি যদি নিতান্ত জোর করে বলো, আমি হয়ত তোমার বাবার কাছে কথাটা পাড়তে পাড়ি। দেখা যাবে তখন কি ফল দাঁড়ায়। তবে কথাটা কি জান—খুব যদি অসুবিধে হয়, আমার কাছেই না হয় কদিনের জন্যে যৎ সামান্য—

কি দবকার—ফাস্তোভের মহানুভবতা নিয়ে যেন লীলা কবে ভিক্টব। বলে— কি দবকাব। তাব চেযে ববং যদি বাবাকে একবাব বলেন আপনি একটা চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত হযে যেতে পাবে।

সেই সঙ্গে নাকের ডগায় নখ দিযে খুঁটতে লাগল ভিক্টব। যেন কত অনিচ্ছায় বললে—তা হোক। আপনি যখন এত কবে বলছেন, বেশি নয গোটা পঁচিশেক রুবল—আপনাব কাছে ও আব এমন কি—আপনার কাছে আমাব মোট কত দাঁডাল ধাব?

ও আব এমন কি? সব শুদ্ধ হবে বোধ হয পঁচাশী রুবল।

ঠিক আছে। এই নিয়ে একশ দশ হল আব কি। ও আমি এক সঙ্গে থোকই দিযে দেবোখন।

পবোপকাবেব এমন সুযোগ হেলায হাবাতে চাইলে না ফাস্তোভ। পাশেব ঘবে গিযে তখুনি পঁচিশ রুবল এনে নিঃশব্দে সমর্পণ কবে দিল ভিক্টবেব হাতে। ক্লান্ত হাত বাডিযে নিল সে। মস্ত বড়ো হা কবে হাই তুললে। সেই সঙ্গে ধন্যবাদেব মত কি একটা শব্দ ঘড ঘড কবে বেবিযে এল তাব মুখ থেকে। তাবপব শবীবটা বাঁকিযে আড়মোডা ভেঙে সোফা থেকে টান হযে উঠে দাঁডাল।

আব ভালো লাগে না। জানেন—বললে ভিক্টব—আব ভালো লাগে না এ ভাবে। এক এক সময ভাবি বিবাগী হযে যাই।

সে যাবাব উদ্যোগ কবতেই ফাস্তোভ তাব দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকালে। বুঝতে পাবলাম বন্ধুব মনে কিসেব একটা দমকা ঝড উঠেছে।

অনেকক্ষণ লডাই কবলে ফাস্তোভ মনেব সঙ্গে। শেষে সংকুচিত হযে বলে ফেললে—পেন্সন—কাব যেন পেন্সনেব কথা বলছিলে

তুমি ভিক্টর ?

দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে গেল ভিক্টর।

টুপিটা মাথায় চাপিয়ে বললে—সপ্রতিভ ভাবেই বললে—সে কি, জানেন না আপনি ? সুসানা একটা মাসিক মাসোহারা মতন পায়, আপনি জানেন না কিছু ? সে এক ভারী আশ্চর্য গল্প। আপনাকে অবশ্য বলতে বাধা নেই। বলব'খন একদিন অবসর মত। বললাম না সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার—রীতিমত আজগুবি ঘটনা। কিন্তু আমার ব্যাপারটা বাবাকে বলতে আপনি নিশ্চয়ই ভুলবেন না। জানেন ত ও-লোকের মন টলানো সহজ নয়। রীতিমত গণ্ডারের চামড়া। মানে, আদতে জার্মান মাল—তার ওপর রাশিয়ান কারিগরী। অবশ্য আপনি থাকতে আমার নিরাশ হবার কারণ নেই। ও চামড়া ভেদ করার ক্ষমতা একমাত্র আপনারই আছে। শুধু দেখবেন আমার ঐ সৎমাটি যেন ও চত্বরে না থাকে সে সময়। ওকেই দস্তুর মত ভয় করেন কিনা আপনার প্রফেসর। যাই হোক, এখন চলি তাহলে।

ভিক্টর বিদায় নিয়ে যাবার পর ফাস্তোভ আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলে না। বললে, কী নীচ মন দেখেছ ছোকরার ?

গম্ গম্ করে আগুন জ্বলছিল ঘরেব ভেতর। সেই আগুনেব আভাতেই কিনা বুঝতে পারলাম না, দেখলাম ফাস্তোভের মুখখানা জ্বলন্ত কয়লার মত রাঙা হয়ে উঠেছে।

অপরিসীম গ্লানি বোধ হওয়ায় ফাস্তোভ আমার দিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিলে।

আমি আর তাকে ঘাঁটালাম না। বিদায় নিয়ে এলাম নিঃশব্দে।

॥ ১২ ॥

সারাদিন এলোমেলো ভাবনায় কেটে গেল আমার। ফাস্তোভ সুসানা আর তার আত্মীয় স্বজনের কথা নিয়ে আকাশপাতাল ভাবলাম। ওদের পরিবারে কি যেন একটা রহস্য নাটকের অভিনয় চলেছে আমাদের সকলের অগোচরে, এমনি একটা আবছা অনুভূতি হতে লাগল আমার।

দেখে যতদুর মনে হল সুসানা সম্বন্ধে ফাস্তোভের মন খুব বেশি অনাসক্ত নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সুসানার কথাও ভাবলাম। সে কি ভালবাসে ফাস্তোভকে ? যে-মেয়ের মনে ভালবাসার রঙ ধরেছে সে অত বিষণ্ণ হয়ে থাকে কেন ? মেয়েটিই বা কেমনধারা কি জানি ? এইরকম নানা চিন্তা অবিরত ঘুরপাক খেতে লাগল মনের মধ্যে। ফাস্তোভের দরজায় ধর্ণা দিয়েও যে এ-রহস্যের কোনো সমাধানসূত্র পাব না সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। এমনি ভাবে সারাদিন ধরে নিজের মনের সঙ্গে নানা টানাপোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত একলাই প্রফেসরের বাড়ি যাব ঠিক করে ফেললাম। পরের দিন করলামও তাই। একলাই প্রফেসরের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

ওদের বাড়ির সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিপথটায় ঢুকেই কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল । একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগল। সে হয়ত কথাই কইবে না। এমনি এসে বসে থাকবে বচনহারা হয়ে। সেদিন খুব একটা আত্মীয়তার ভাব প্রকাশ করেনি মেয়েটা। কেমন একটা পর-পর ভাব রয়েই গিয়েছিল সর্বক্ষণ। হয়ত আজকের এই মিষ্টি সন্ধ্যেটা হামবড়া প্রফেসর আর তার রাঁধুনীমার্কা বৌয়ের পাল্লায় পড়ে বিষিয়ে যাবে।

এত সব জেনেও তবু এলাম কেন বোকার মত ?

নিজের মনে যতক্ষণ এইসব নিয়ে তোলপাড় করছিলাম, তার ফাঁকে ওদের ছোকরা চাকরটা আমাকে দেখতে পেয়ে এক দৌড়ে বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কে ? কার কথা বলছ ? এইরকম দু'একটা কথাবার্তা ঘরের ভেতর থেকে শুনতে পেলাম। তারপরই ভারী পায়ের চটির চট্‌পট্‌ শব্দ শুনলাম। দরজাটা একটু ফাঁক হতেই দু'দরজার মাঝখানে প্রফেসরের দাড়িভর্তি কদাকার মুখখানা দেখা গেল।

বেশ খানিকক্ষণ লোকটা আমাকে ঠাহর করে দেখলে। তার মুখচোখের ভাবলেশহীন ভঙ্গিটি দেখে মনে হল আমাকে ঠিক চিনতে পারেননি প্রফেসর। তারপর হঠাৎ সেই মুখ চাপা হাসিতে গোল হয়ে গেল। গাল দুটি ফুলে উঠতেই চোখ হল কড়ি কড়ি।

আরে এস। এস। পরম আত্মীয়ের মত কি মধুর সম্ভাষণই না করলেন প্রফেসর। তুমি এসেছ, তাই বলতে হয়। ঘরে এস, ঘরে এস।

এই সন্ধ্যেবেলায় এমনি বিনা নোটিশে এসে পড়েছি বলে প্রফেসর যে খুবই বিরক্ত বোধ করছেন তা বুঝতে আমার বাকী রইল না।

মুখে যতই ভালমানুষী অমায়িকতা দেখান না কেন ভেতরে ভেতরে যে আমায় নরকস্থ করছেন তাও ঠিক। কিন্তু তখন আর আমার কিছু করবার ছিল না। নিতান্ত অনিচ্ছায় নিস্পৃহ ভাবেই তার পিছনে পিছনে ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলাম।

একটা হিসেবের খাতার উপর ঝুঁকে বসে ছিল সুসানা। আমরা ঘরে ঢুকতেই বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে সে আমাকে একঝলক দেখে নিয়ে নিঃশব্দে তার হাতের নখ খুঁটতে লাগল দাঁত দিয়ে। এ অভ্যাস

তার আগের দিনই আমি লক্ষ্য করেছিলাম। যে-সব মেয়েদের মন দুর্বল এইসব অভ্যাস তাদেরই থাকে বলে আমার চিরদিনের ধারণা।

ঘরে সে ছাড়া আর কেউ ছিল না।

নিজের কুঁজের ওপর প্রচণ্ড চাপড় মেরে প্রফেসর বললেন, সুসানাকে নিয়ে কি রকম ব্যস্ত ছিলাম দেখছ ত? সংসারের হিসেবের খাতা নিয়ে বসেছি দু'জনে। বাড়ির গিন্নী এ সব হিসেব নিকেশ বোঝে না। চোখের জন্যে আমি নিজেও পারি না। চশমা ছাড়া পড়তেই পারি না কিনা। কাজেই ও ছাড়া আর উপায় কি বল? আর কর্তাগিন্নী অপারগ হলে এসব ত ছেলেমেয়েদেরই করতে হয়। তাই ত উচিত। অবিশ্যি তাড়াতাড়ির কিছু নেই। লোকে কথায় বলে না হুড়োহুড়ির আড়াআড়ি।

হিসেবের খাতা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল সুসানা। প্রফেসর তাকে বাধা দিলেন। দাঁড়াও, দাঁড়াও। যেয়ো না। অত লজ্জার কিছু নেই। গায়ে না হয় খুব আব্রু নেই, তাতে কিছু আসে যায় না।

সুসানার পরনে দেখলাম হাতখাটো ছেলেমানুষী একটা পুরানো ফ্রক। ডাগর গায়ের সঙ্গে টান টান হয়ে বসে আছে।

সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে প্রফেসর বললেন, এ ছোকরা মানুষ ভাল। অত কেতা দুরস্তর পক্ষপাতী নয় তোমাদের আজ-কালকার ছেলেমেয়েদের মত। কি বল, তাই না? তা ছাড়া ও আমাদের ঘরের লোকের মত। ওর সঙ্গে আর অত আব্রু, ভদ্রতা করতে হবে না। না, কি বল তুমি?

না, না আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আপনারা হিসেবটা শেষ করে ফেলুন আগে।

ঠিক বলেছ। জানো ত আমাদের ভূতপূর্ব জার কী বলতেন? তিনি বলতেন, সময় হল কাজের জন্যে। নিছক নিরেট কাজ। তবে তার মধ্যে দু'একটা খুচরো মিনিট আনন্দ অবকাশে খরচ করলে দোষ নেই। আমরা অবশ্য সেই কাজে দু'এক মিনিট লাগাচ্ছি শুধু। কাজটা বরং শেষই করেনি। কি বল হে ছোকরা?

তারপর আমার দিকে পিছন ফিরে নিচু গলায় বললেন সুসানাকে।

কি বলছিলান যেন। সেই তের রুবল তিরিশ কোপেক। সেই টাকাটার হিসেব দিলে না ত?

ও টাকাটা ভিক্টর নিয়ে গেছে। বলে গেছে যে আপনিই নাকি নিতে বলেছেন টাকাটা।

আমার কানে না পৌঁছায় এমনি নিচু গলায় কি যেন জবাব দিল সুসানা।

আমি, আমি বলেছিলাম নিতে। এই কথাই বলেছে ও? বলেছে? চাপা গর্জনে মানুষটা যেন বিদীর্ণ হয়ে যাবে মনে হল। দাঁড়িয়ে চালোয়া হুকুম দিয়েছিলাম তাই না? সেই কথাটা অন্তত জিজ্ঞাসা করতে পারতে ত? আর বাকী সতের রুবল সেটা কার হাতে সঁপে দিয়েছ।

বিছানার দাম দিতে হল যে।

সে কি?

বিল দিয়েছিল যে।

বিল? কিসের বিল দেখি।

সুসানার হাত থেকে খাতাটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে নাকের উপর রূপোর ডাঁট লাগানো চশমাটা বসিয়ে আঙুল দিয়ে হিসেবের অঙ্কগুলি পরীক্ষা করতে লাগলেন প্রফেসর। অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন:

তোশকওয়ালা ! তোশকওয়ালা ! তোমরা দেখছি আমায় ফতুর করবে। ঘরে আর কিছু রাখবে না। দেউলে করে তবে ছাড়বে। তা হলেই তোমাদের খুব আনন্দ হয়, তাই না ?

চলতে চলতে আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে বললেন, মরুকগে হিসেব। ও খাতাটা এখন তুলে রাখ। পরে ফের মাথা ঘামানো যাবে। এখন দয়া করে হিসেবের খাতাটা নিয়ে বিদায় হও। পোশাকটা বদলে এসে বস এইখানে। সন্ধ্যেটা একেবারে মাটি হয়ে যাবার আগে একে দুখানা গান শুনিয়ে দাও পিয়ানোয়। কি, সেটুকু অন্তত পারবে ত ?

সুসানা মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভারী আনন্দ হবে আপনার হাতের বাজনা শুনতে পেলে।

পাছে সে আগেই না বলে দেয় তাই বললাম আমি তাড়াতাড়ি করে। সে আমার পরম সৌভাগ্য। যদি আপনার অসুবিধা না হয়।

ওর আবার অসুবিধা কি ? কিন্তু আর দেরী নয় সুসানা। শিগগীর করে চলে এস। একে বিমুখ করো না। দেখো।

সুসানা কোনো সাড়া দিল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

॥ ১৩ ॥

সুসানা যে সত্যি ফিরে আসবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। কিন্তু আমার সব সংশয় সন্দেহকে উল্টে দিয়ে যেন চকিতেই ফিরে এল।

দেখলাম যেমন ছিল তেমনিই চলে এসেছে সে। প্রসাধন সারেনি। এমন কি পরনের সাজও বদলে আসেনি। যেমন বসে ছিল তেমনি করে এসে জানালার ধারে কোণ ঘেঁসে বসল।

তার কালো চোখের গভীর স্থির দৃষ্টি দুবার সে আমার মুখের উপর স্থাপন করলে। আজ সন্ধ্যেবেলায় তার প্রতি যে মনোরম সৌজন্য দেখিয়েছি আমি, তারই জন্যে এইটুকু স্নেহদৃষ্টি দিয়ে পুরস্কৃত করতে চাইল সে আমায়, না ঐ বিষণ্ণ মেয়েটির বুকের হিমপ্রদেশে আজ একটু উষ্ণ বসন্তের বাতাস বয়েছে, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি। তবে কৌতূহলের সঙ্গে তার মনের মধ্যে আমার প্রতি যে একটু দরদভরা প্রীতি উথলে উঠেছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

সেটুকু ঠিক কি করে বুঝলাম সেই কথাই বলছি। আমাদের দু'জনকেই অবাক করে দিয়ে সুসানা নিজে হতেই পিয়ানোর কাছে টুল নিয়ে বসল। তারপর তার নরম আঙুল পিয়ানোর উপর রাখল। মরালগ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়ে মধুর গলায় আমায় জিজ্ঞেস করলে, কি শুনবেন বলুন।

অবশ্য আমার জবাব নেবার তর সইল না তার দেখলাম।

নিজের মনের পুলকে স্বরলিপি খুলে পিয়ানোয় সুরের ইন্দ্রজাল বোনা শুরু করলে সে।

ছেলেবেলা থেকেই গানবাজনা আমার ভারী ভাল লাগত। কিন্তু যে বয়সের কথা বলছি তখন সুরের খুব একটা জ্ঞান ছিল না আমার। বড়ো বড়ো ওস্তাদ গুণীদের সুরের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। সুসানা যে কী সুর বাজাচ্ছিল তা ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে প্রফেসরের কথায় আমার জ্ঞানোদয় ঘটল।

আহা-হা—কী অপূর্ব সুর দিয়ে গেছেন বীটোফেন।

এফ মাইনরে ওপাশ সাতান্ন। সুরস্রষ্টার অমর সোনাটা কি নিপুণ হাতেই না প্রাণবন্ত করে তুললে সুসানা। এমন পাকা

মুন্সীয়ানার সঙ্গে এত দৃপ্ত কুশল কাজ ওর মত মেয়ের কাছে শুনতে পাব আশা করতে পারিনি। সোনাটার প্রথম বিস্তারের মুখেই সুরের এমন অপূর্ব মূর্চ্ছনা সে জাগিয়ে দিলে আমার অনু-ভূতিতে, প্রাণের বীণায় জাগিয়ে দিলে এমন আকুতির উচ্ছ্বাস যে মন মধুর মূর্চ্ছায় বিবশ হয়ে গেল। মধুর একটি আনন্দের ধারায় শুচিস্নাত হয়ে গেল সত্তা। যেন সহসা অন্তরের অন্ধকারকে বিমথিত করে বিকশিত হল জ্যোতির্ময়ের এক শতদলপদ্ম।

সেই অমৃতের অকুণ্ঠ ধারায় রসসিক্ত হয়ে উঠল মন। শরীরে আর সাড় রইল না। চেতনা যেন কোন অন্তহীন রূপের সমুদ্রে অবগাহন করতে লাগল। একটি অস্ফুট বেদনাধ্বনি কণ্ঠের কাছে কুণ্ঠিত হয়ে রইল। সাহস হল না তা প্রকাশ করতে। কি জানি যদি শুনতে পায় সুসানা, জানতে পারে তার সুরে আমার কী হচ্ছে। আমি তার ঠিক পিছনেই বসে রয়েছি, মুখখানি দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু তার গ্রীবার উপর উত্তরঙ্গ কেশের হিন্দোল আমার হৃদয়ের সূর্যমুখীর সঙ্গে একতালে দুলছে। সারা শরীর তার ক্ষণে ক্ষণে দোল খাচ্ছে। অমৃতেব ধাবা আছড়ে পড়েছে চিত্তের বেলাভূমিতে। বসে বসে দেখছি তার সুডৌল বাহুর বঙ্কিম ভঙ্গিটুকু। চাঁপার মত আঙুলগুলি সুরের দ্রুত লয়ে পাল্লা দিচ্ছে। এক মহিম্ন সুরের লোকে পৌঁছে যাবার দ্রুততায় মুহূর্তে মুহূর্তে বেগবান হচ্ছে।

এক সময় তার সুরের অবসান হল। সারা ঘরে বাজতে লাগল নিঃশব্দে ঝঙ্কার। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস আমার বুকখানাকে খালি করে দিয়ে চলে গেল।

নিশ্চল প্রতিমার মত পিয়ানোর সামনে বসে রইল সে।

আহা-হা—প্রফেসর সশব্দে ফেটে পড়লেন যেন। এতক্ষণ তিনিও নিবিষ্ট চিত্তে উপভোগ করছিলেন সংগীতরস।

এবার সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন—মন মাতানো সুর বটে। আজকাল এইসব ত লোকের ফ্যাশন দাঁড়িয়েছে। জিনিসটা ভালো বটে, কিন্তু নির্ভুল বাজাতে পারে না কেন লোক আমি তাই ভাবি। একসঙ্গে দুটো চাবীতে হাত দিয়ে বাজানোর মানেটা কি? একসঙ্গে দুটো? খালি জলদ জলদ। তাতিয়ে দেওয়া আর কি। গরম গরম। গরম লেবে গরম।

পথের ফিরিওয়ালা যেমন সুর টেনে টেনে বিকট চীৎকার করে তেমনিভাবে চেঁচাতে লাগলেন প্রফেসর।

তার মুখের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে দেখলে সুসানা এক ঝলক। আমিও মেয়ের চোখের দিকে তাকালাম। দেখলাম নতনয়নের শিওরে ওর জোড়া ভুরু দুটি কপালের উপর অনেকখানি উঠে গেল। দেখলাম তার গালে আবীর ছড়িয়ে দিলে কে। দেখলাম তার কালো চুলের কোলে দুধসাদা কান দুটি হঠাৎ কেমন রাঙা হয়ে উঠল।

বড়ো বড়ো ওস্তাদের বাজনা ঢের ঢের শুনেছি আমি। প্রফেসর বললেন—কিন্তু ফিল্ডের মত মিঠে হাত দেখিনি কখনো। তাঁর কাছে এ সব ঝুটোমাল। দূর দূর। আর তার নিজের স্বর-লিপিগুলো—সে-সব অপূর্ব জিনিস। তার কাছে এই তোমাদের —টফু-টু-টু-ট্রা। এসব কাঁচা শিক্ষানবীশদের কাজের মত শোনায় আমার কানে। যেমন তেমন করে চাবীগুলো টিপে—ড্রাম ড্রাম করে আওয়াজ তুললেই হল আর কি? মানে থাক আর না থাক, কিছু আসে যায় না তাতে। ফু:

বকতে বকতে প্রফেসর গলদঘর্ম হয়ে উঠলেন। রুমাল বার করে কপালের স্বেদ মুছে নিয়ে বললেন—অবশ্য তোমায় মনে করে বলিনি কথাগুলো। তোমার হাত মিষ্টি। তোমার দুঃখ পাবার কিছু নেই।

লোকের নিজের নিজের রুচি—চাপা ক্ষীণকণ্ঠে বললে সুসানা। তার চাঁপার মত ঠোঁট থর থর কাঁপতে লাগল। বললে—তোমাব কথায় আমি মনে কিছু করিনি। তোমার কথায় আমার গায়ে আঁচ লাগে না—তা তুমি জান।

তা ত বটেই। তা বলে তুমি যেন ভেবোনা—আমার দিকে চেয়ে প্রফেসর বললেন—তা বলে তুমি ভেবোনা বন্ধু যে আমরা খুব সরল নিষ্পাপ বলে অন্যলোকের সমালোচনায় আমাদের মনে দাগ কাটে না। জিনিসটা মোটেই তা নয়। আমরা হলাম গিয়ে এক একজন মহারথী—যাকে বলে সবজান্তা পণ্ডিত আর কি। আমাদের মাথায় কারুর টুপি ধরে না। এক একটি দম্ভের হিমালয় বলতে পারো।

প্রফেসরের কথায় আমার বিস্ময়ের সীমাপরিসামা রইল না। বিষাক্ত আক্রোশে যেন টগবগ করে ফুটছিল সুসানা প্রফেসরের কথায়। কথা ত নয় যেন বিষ মেশানো তীর। যার বুকে বিঁধছে সেই বুঝছে তার জ্বালা কি। মনের জ্বালায় প্রফেসরের গলা যেন বুজে আসতে লাগল। অন্য সময় হলে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলতেন প্রফেসর। তার বদলে এখন একটা চাপা ঘড় ঘড় শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

প্রফেসরের কথার একটি অক্ষর জবাব দিলে না সুসানা। একবার মাথা নেড়ে তেমনি নিঃশব্দে বসে রইল। শুধু মুখখানি তুলে

ধরে কনুই দুটো বিপরীত করতল দিয়ে জড়িয়ে প্রফেসরের দিকে সোজা তাকিয়ে রইল নীরব অবজ্ঞায়।

এতক্ষণে তার পরিপূর্ণ দৃষ্টির গভীরতা আমার নয়নগোচর হল। দেখলাম সেই স্থিত চোখের দৃষ্টিতে অনির্বাণ শিখার মত জ্বলছে ঘৃণা আর আক্রোশ। কতকাল ধরে সেই আগুনের জ্বালায় ওর ফুলের মত প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে।

মনটা এমন খারাপ হয়ে গেল যে বলে বোঝাতে পারব না।

আবহাওয়াটা হাল্কা করে দেবার জন্যেই সহজকণ্ঠে আমি বললাম—এ আর আশ্চর্য কি? আপনারা দু'জনে গানের দুই কূলে বাস করছেন। এরকম মতান্তর হওয়ায় কিছুমাত্র আশ্চর্য নেই। তবে জানেন প্রফেসর—আমার নিজের মত যদি বলতে বলেন, আমি ওর দলেই ভোট দেবো। এ যুগের সঙ্গেই আমার মনের মিল। অবশ্য আমাকে ঠিক গানের সমজদার মনে করবেন না। আমি অনেকটা বার মহলেরই লোক। কিন্তু আজ ওর—মানে সুসানার মিঠে হাতে সুর শুনলাম, এমনটি আর কোথাও শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

প্রফেসর যেন বাঘের মত হানলে পড়লেন আমার উপর।

কাশতে কাশতে মুখখানা বেগুনে হয়ে গিয়েছিল। সেই কাশির ধমকের মধ্যেই গর্জে উঠলেন—আমরা সেকালের লোকেরা যে তোমায় দলে টানবার জন্যে সাধাসাধি করছি এমন কথাই বা কে তোমার মাথায় ঢোকালে হে ছোকরা। আমাদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গেই আমাদের মনে মতে মেলে না। না মিলুক, তাতে আমাদের আক্ষেপ নেই। তোমাদের আর্ট বল, নীতি বল, জীবন বল, কিছুর সঙ্গেই আমাদের মিল খায় কি সুসানা? তুমিই প্রাণ থেকে বল।

উত্তরে একটা বিদ্রূপের হাসি হাসলে সুসানা প্রফেসরের দিকে চেয়ে। বললে—বিশেষ ঐ আপনার নীতির দিক থেকে—না সে দিক থেকে আপনাদেব সঙ্গে আমাদের কোনো মিল নেই—থাকতেও পারে না।

বলতে বলতে সুসানার ঠোঁট দুটি থর থর করে কেঁপে উঠল। দেখলাম ওর চাউনিতে দুর্যোগেব মেঘ ঘনিযে উঠেছে। ঝডেব পূর্বাভাস দেখলাম চোখের কোণে কোণে।

সত্যি কথা। খুবই সত্যি কথা বলছে সুসানা—কিছুতেই হার মানবেন না এমনি ভাবে যেন কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন প্রফেসর।

বললেন—আমি অবিশ্যি দার্শনিক নই। তোমাদের মত অত বড়ো বড়ো ভাবনা আমাব মাথায় ঢোকে না। সাদামাটা লোক আমরা, সংসারের সংস্কার দিযে তৈরী।

এবার বোধ হয় সুসানার হাসির পালা পড়ল।

বললে—সে কথা কি আমি শুনি? কতবার যে নিজে দেখলাম নীতির বালাই চুকিয়ে দিয়ে আপনি দিব্যি পরমান্ন লুটে নিলেন।

ছিঃ ছিঃ। এসব কথা কে বললে তোমায়? কি বলছ তুমি, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছেন না, না? সত্যি, স্মৃতিশক্তি আপনাব একদম গেছে।

হঠাৎ সামনে সাপ দেখলে লোকে যেমন হতবুদ্ধি হয়ে পিছু হটে, প্রফেসর তেমনি ভাবে দু'পা পিছিয়ে এলেন।

আমি—আমি—কি বলছ তুমি?

হ্যাঁ-হ্যাঁ তোমাকেই বলচি, আর কাউকে নয় তোমাকেই।

হঠাৎ কী একটা থমথমে আবহাওয়া যে হল বলে বোঝাতে পারব না।

তার মধ্যেই এক সময় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন প্রফেসর। কিন্তু এবার তার কথায় আর তেমন জ্বালা ছিল না।

বললে—কি সাহস তোর সুসানা? আমি ত ভাবতেই পারি না, এত বড়ো অপমান আমাকে তুই করতে পারিস? ঔদ্ধত্য—এ ঔদ্ধত্য অসহ্য—

হঠাৎ যেন কি একটা হল।

ললিত থেকে একেবারে দীপক।

দেখলাম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে মেয়ে। প্রফেসরের মুখোমুখী হয়ে চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে তার সামনে। সারা শরীরে যুদ্ধং দেহি ভাব। বুকের উপর দুটি হাত সমকোণে চেপে ধরে আঙুল দিয়ে বিপরীত বাহুমূলে টোকা দিচ্ছে নিঃশব্দে অবহেলায়। দেখলাম দীর্ঘছন্দা সেই ঋজু তরুণীদেহ যেন পরাশ্রিত লজ্জিতলতা থেকে হঠাৎ নবীন বনস্পতির মত দর্পিত দৃপ্ত হয়ে উঠেছে।

মুখের আদলই বদলে গেছে তার। যেন এক ভয়াল সুন্দর ভৈরবী হঠাৎ ভর করেছে ওর সর্বাঙ্গে। দুটি চোখ ঝকঝক করছে শাণিত ইস্পাতের মত। শীতল মৃত্যুঘাতী দৃষ্টি সেই চোখে। দুটি পেলব ঠোঁট এতক্ষণ থরথর করে কাঁপছিল। সেই কম্পিত বঙ্কিম রেখা দুটি চাপা ঠোঁটের সীমান্তে হঠাৎ স্থির সরল হয়ে গেল। ক্ষমাহীন চাপা আক্রোশে সমস্ত স্নায়ু সংহত করে মেয়েটা যেন দুঃসাহসের খেলায় নামতে চাইলে।

মেয়ের সেই চ্যালেঞ্জ নিলেন না প্রফেসর।

শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে। যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে এক পা পেছিয়ে এলেন তিনি। তারপর ভারী পাথরের মত সোফার উপর বসে পড়লেন।

আমার মত বাইরের লোকেরও বুঝতে বাকী রইল না যে অত বড়ো লড়নেওয়ালা মানুষও ভয় পেয়ে গেছেন। প্রফেসরের চোখেমুখে তার কোনো লক্ষণটিই বাকী নেই।

এইবার সুসানার পালা পড়ল। পরাভূত শত্রুর দিক থেকে এতক্ষণে মুখ ফিরিয়ে নিলে বিজয়িনী। আমার দিকে চেয়ে চাপা উল্লাসে হাসলে সে। যেন বুঝিয়ে দিতে চাইলে কত অনায়াসে শত্রুকে সে বশ করেছে।

স্মিত হাসি মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দর্পিতা।

আরামকেদারায় কতক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন প্রফেসর। যেন আত্মমগ্ন হয়ে রইলেন অতীত স্মৃতির কুয়াশায় অবলুপ্ত হয়ে। তারপর হঠাৎ যেন অচৈতন্যের ঘোর ভেঙে গেল। শরীরের অবসাদ ছিন্নকন্থার মত ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। আমার কাঁধে চাপড় মেরে সশব্দে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

দেখছ কাণ্ডখানা। দশবছর হল ঐ মেয়েটা আমার কাছে রয়েছে। দশবছর ধরে দেখছে, তবুও বুঝতে পারলে না আমায়। কোন্ সময় পরিহাস করি, কোন কথায় গুরুত্ব দি কিছুতেই ও বোকা মেয়ের মাথায় তা ঢোকে না। তুমিও বাপু খুব অবাক হয়ে গেছ না? দেখ আর কদিন আমায়—তাহলেই বুঝতে পারবে প্রফেসর মানুষটি তোমাদের কেমন?

তা আবার নয়। এতদিনে তোমায় ঠিক চিনেছি—মনে মনে ভাবলাম আমি। সমস্ত শরীরটা ঘৃণায় রী রী করতে লাগল।

আমাদের মত বুড়োহাবড়াদের কি আর তোমরা এত সহজে চিনতে পারো—পারো নাকি কখনো চিনতে—আমায় এগিয়ে দিতে আসছিলেন প্রফেসর অন্ধকার বারন্দা পেরিয়ে। নিজের

ভুড়ির ওপর পট পট করে পড়ছিল তার নিজের হাতের চাপড়। বললেন—মনে হবে বটে যে লোকটা আমি ভারী বেরসিক। মানে সংসারের নানা ঘাটে ঘা খেয়ে খেয়ে বাইরেটায় কেমন যেন রূঢ় হয়ে পড়েছি। কিন্তু মনটা আমার খারাপ নয়।

আমি উত্তর না দিয়ে হুড়দাড় করে সোজা রাস্তায় নেমে পড়লাম। এই ভালমানুষ লোকটির ছায়া এড়াতে যত শক্তি আছে জড়ো করে ছুটে পালানোব কেমন একটা তীব্র বাসনা হতে লাগল।

॥ ১৪ ॥

ওরা সব এ ওকে ঘৃণা করে ঐ বাড়িতে। একলা ফেরার পথে এই কথাটাই বার বার আমার মনে হতে লাগল। প্রফেসর লোকটি মোটেই সাধুসজ্জন নয়। ওর জীবনে কোথাও একটা কলুষিত ইতিহাস আছে। তবে মেয়েটি লক্ষ্মী। ওদের সম্পর্কের মধ্যে কোথাও একটা বিপজ্জনক ফাটল আছে। ভদ্রতার সাজ পরানো নোংরা একটা রহস্য। নইলে এই নিরন্তর সংঘর্ষের কারণ কি? মানে কি এই সব কুটীল ইংগিতেরই? বাপের কথায় ঐ ভাবে হঠাৎ ফেটে পরা আর অমন সামান্য কারণে? একেবারে বাইরের লোকের সামনে নিজেদের পরিবারের কলঙ্ক ঐ ভাবে বে-আব্রু করার অন্য কোনো সরল উত্তর আমি পেলাম না মনের মধ্যে।

পরদিন আমি আর ফাস্তোভ নাটক দেখতে যাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেন্সর কর্তৃপক্ষের হাতে ধর্ষিত বিক্ষত হওয়ার পর হাসির নাটকটি এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে। নায়কনায়িকার অভিনয় দেখে খুব বাহবা দিলাম আমরা। বেশ মনে পড়ছে তৃতীয় অঙ্কে বলনাচের দৃশ্যটি খুবই জমে উঠেছিল। আমরা তন্ময়

হয়ে দেখছিলাম। একজন দর্শক ত ভাবাবেগে ব্যাঙের মত লাফিয়ে উঠছিল থেকে থেকে আর তার মাথার পরচুল সেই তালে তালে এ-পাশে ও-পাশে দুলছিল। পাদপ্রদীপের সামনের অভিনয়ের চেয়ে তার পার্টেও কম হাসির খোরাক ছিল না। দর্শকরা তাই দেখে আনন্দে ফেটে পড়ছিল।

অভিনয় দেখে আমরা যখন বেরিয়ে আসছি বারান্দায় ভিক্টরের সঙ্গে ধাক্কা।

আপনারাও থিয়েটারে এসেছিলেন ?—আনন্দে আত্মহারা হয়ে দুটি হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলে ভিক্টর। বললে—অথচ আশ্চর্য দেখুন—দেখাই হল না আমাদেব। ভারী আনন্দ হল আপনাদের দেখে। চলুন আমার সঙ্গে। আসুন। রাতেব খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। আমিই সব খবচা করব। আসুন—আসুন।

ভিক্টরের এক অদ্ভুত উত্তেজিত উল্লসিত অবস্থা। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো তার যেন নাচছিল উত্তেজনায়। মুখে উচ্ছল হাসি—গাল যেন সিঁদুর মাখা।

হঠাৎ এত আনন্দের কি হল ?—প্রশ্ন করল ফাস্তোভ।

আনন্দ ? সত্যি শুনতে চান সে কথা ?

ভিড় থেকে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল ভিক্টর আমাদের। নিরিবিলিতে পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে বাতাসে নাচাতে লাগল। দেখে ফাস্তোভের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

তোমার কর্তা মশায়টি দেখছি খুব দবাজ হয়ে পড়েছেন।

এ কথা শুনে প্রাণ খুলে হেসে উঠল ভিক্টর। বললে—দরাজ ! আপনি বলছেন কর্তা দরাজ ! একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

আজ সকালে আপনার কথার উপর নির্ভর করে তার কাছে হাত পেতেছিলাম। হাড় কঞ্জুস বুড়োটা কি বললে শুনবেন? চাও ত পঁচিশ রুবল পর্যন্ত দেনা শোধের ভার নিতে পারি। ব্যাস্ ঐ অবধি। খরচ খরচা সমেত ঐ পঁচিশ। তার বেশি কানা কড়িও নয়। তবে আমার দুরবস্থা দেখে ভগবান মুখ তুলেছেন। এসে গেল একটা দৈব সুযোগ। মানে তিনিই জুটিয়ে দিলেন আর কি?

ঝেড়েছ বুঝি কাউকে—হাল্কা ভাবেই বললে ফাস্তোভ।

ভিক্টরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। চুরি, না না। এ-টাকাটা আমি পেয়েছি একজন সামরিক অফিসারের কাছ থেকে। লোকটা গতকাল এসেছে পিটার্সবার্গ থেকে। তারপর যোগাযোগ আর কি! গল্প করার মত ঘটনা—কিন্তু এ জায়গায় নয়। আসুন আমার সঙ্গে। দু'এক পা গেলেই হবে। আজকের মহড়া আমিই নেব।

এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

॥ ১৫ ॥

হোটেলে একটা আলাদা ঘরে গিয়ে বসলাম আমরা। খাবার এল একটু পরেই। সেই সঙ্গে এল ভাল মদ।

খাদ্যপানীয়ের পরিপুর্ণ সমারোহ সম্মুখে নিয়ে ভিক্টর মুখ খুলল। একটি মেয়েমানুষের বাড়িতে গিয়ে কি ভাবে কি হয়েছিল, কি আমোদ আহ্লাদ করেছিল, সে-সব কথা খুলে বললে ভিক্টর। মুখের কোন রাখ ঢাক রাখল না। সেইখানেই সামরিক অফিসারটির সঙ্গে ভাবপরিচয় হয়। লোকটি ভারী চমৎকার। ছেলেও বড় ঘরের। তবে মগজে বুদ্ধি বলে কোনো পদার্থ নেই।

কথায় কথায় তাসের বাজী ধরার কথা হয়। কথাটা রসিকতা করেই বলেছিল ভিক্টর কিন্তু লোকটি অতশত না বুঝে বাজী ধরলে। শর্ত হল সে যত জিতবে সব পাবে মেয়ে মানুষটি। ভিক্টর যা জিতবে তা তারই থাকবে।

অফিসার তাইতেই রাজী। বাজীর প্রথম দান সেই ফেললে।

বুঝুন ব্যাপারটা—দুই হাত জড়ো করে পরম বিজ্ঞের মত বলতে লাগল ভিক্টর।

বুঝুন ব্যাপারটা। আমার পকেটে ছিল সবশুদ্ধু দুটি টাকা। ক'দানেই একেবারে সাফ হয়ে গেলাম আমি। একদম ফতুর যাকে বলে। তখন কি ভাবে কি হল জানিনা। ভগবান যেন আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন। অফিসারের মেজাজ গেল বিগড়ে। রেগে নিজের সব ভালো ভালো তাস শো করে যেতে লাগল সে। বলব কি আপনাদের, দেখতে দেখতে লোকটা সাত শ' টাকা বাজী হারলে। তাতেও ছাড়বার পাত্র নয় সে। জিদ করতে লাগল, যাতে আমি আরও ক' হাত খেলি। কিন্তু আমি সে বান্দা নই। বরাত রসালো থাকতে থাকতেই সরে আসা ভাল। তাই আমি আর কথা বাড়ালাম না, টুপিটা মাথায় থাবড়ে বসিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়লাম। ভগবানের দয়ায় এখন কিছুদিন ঐ বুড়ো কেপ্পনটার কাছে হাত পাতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে একটু আমোদ ফুর্তি করবার রসদ সংগ্রহ হয়েছে। এই—বয় —বয়। আউর এক বোতল লাও। আসুন আর একবার গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

তার পয়সায় মদ খাবার রুচি হচ্ছিল না। রুচি ছিল না তার মত অপদার্থের মুখে নোংরা কথাবার্তা শোনবার কিন্তু তবু মদ খেলাম

আমরা। তার গল্পের মোটা রসিকতায় হা-হা করে হাসলাম প্রাণ ভরে। আরম্ভটা একটু সমীহ করেই করেছিল ভিক্টর কিন্তু পেটে মদ পড়তেই তার মেজাজ খোলতাই হয়ে গেল। তখন সার্কাসের ক্লাউনের মত হাত পা ছুঁড়ে সে বকতে শুরু করে দিল। দেখে এমন অরুচি হতে লাগল। যেন একটা নোংরা জিনিসের সান্নিধ্যে বসে, সর্বাঙ্গ রী রী করতে লাগল ঘৃণায়।

কি জানি কেন ভিক্টরের বোধ হয় জ্ঞান হোল যে তার কথাবার্তায় আমরা আনন্দ পাচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল সে। সারা মুখে একটা অন্ধকার নেমে এল ধীরে ধীরে।

দু' বার বড়ো বড়ো হাই তুললে ভিক্টর। ওয়েটারকে ডেকে খানিকটা বকাঝকা করলে। তারপব ফাস্তোভের দিকে তাকিয়ে যেন অনেকটা যুদ্ধং দেহি ভাবে বললে—

আচ্ছা, আমার ওপর আপনার এত বিরাগ কেন বলুন ত। কি করেছি আমি আপনার যে আমায় আপনি দেখতেই পারেন না ?

শুনে বন্ধু আমার এক মুহূর্তে যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

তারপর খানিকটা সময় নিয়ে বললে—সে কি ? ও কথা বলছ কেন ভাই ?

এমনি কি আর বলছি ? দেখছি কিনা যে আপনারা আমাকে খুব খারাপ চোখেই দেখেন। আর শুধু কি আপনি—ঐ যে আপনার—এই কথা বলে আমার দিকে আঙুল দেখালে ভিক্টর। ভাবেন যে সমাজসংসারে আপনারা খুব বড়ো বড়ো মানুষ। বড়ো বড়ো কথা ভাবেন—সেই রকমে চলেন। আমাদের মতনই যে আপনারা দোষ গুণে মেশানো সেটা ভুলে যান সব সময়। পাপ অন্যায় আপনারাও কিছু কম করেন নাকি ? বোধ করি আমাদের

চেয়েও বড়ো পাপী আপনারা। সেই যে কথায় বলে না—মুখে ভালো পেটে—

শুনে ফাস্তোভের মুখখানায় রক্তের সমুদ্র ঠেলে উঠল।

একথা বলার মানে ?

মানে আমি ত আর অন্ধ নই। চোখের উপর যে সব জিনিস ঘটছে তা কি আর আমি দেখি না। না, বুঝি না এমন বেবাক বুদ্ধু আমি। তবে আমার ভারী বয়ে গেছে। ঘরের কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামানো কোনোদিনই আমার স্বভাব নয়। আর আমার বোন সুসানাও এমন কিছু সতীলক্ষ্মী মেয়ে নয়। এর আগেও সে এ-কাজ করেছে। কাকে বাদ দেবো সংসারে। তবে আমিই বা একা কেন চোর দায়ে ধরা পড়ব ?

কি বাজে বকছ তুমি ভিক্টর। তোমার কোনো কথার মানে হয় না। মদ খেয়ে তোমার নেশা হয়ে গেছে—বলে দেওয়াল থেকে ওভারকোটটা হাতে নিয়ে নিলে ফাস্তোভ। আমার দিকে চেয়ে বললে—কোথাকার একটা ইডিয়েটের কাছে কিছু টাকা ফাঁকি দিয়ে এখানে এসে নির্জলা মিথ্যে কথা বলছে। চল হে যাওয়া যাক্।

সোফায় আরাম করে এলিয়ে বসে ছিল ভিক্টর। ফাস্তোভের কথা শুনে বসে তেমনি করে পা দোলাতে লাগল। তারপর নিরুত্তাপ গলায় বললে—

মিথ্যে বলছি ? মিথ্যে যদি বলছি তবে সত্যবাদীরা আমার পয়সায় মদ গিললেন কি করে ? সে পয়সা ত আমি ঠকিয়ে রোজগার করেছি। আর মিথ্যে কথা ? আপনাদের কাছে মিথ্যে কথা বলে আমার লাভ ? আর সুসানাকে এর আগেও অন্য লোকে ভোগ করেছে সেও বুঝি আমার দোষ ?

মুখ সামলে কথা বলো ভিক্টর—যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল ফাস্তোভ—মুখ সামলে কথা বলবে নইলে—

নইলে কি ?

কি তা জানতে পারবে। চলে এসো—বলে আমার হাত ধরে টান দিল ফাস্তোভ।

দরজার চৌকাট পার হতে হতে শুনলাম ভিক্টর আমাদের টিটকারি দিয়ে বলছে—অহো! বীরপুরুষ আমাদের গায়ে হাওয়া দিলেন। সত্যি কথা শোনার ক্ষমতা নেই কিনা। সত্যি কথায় যে বড়ো জ্বালা।

ওর কথা ছেড়ে দাও—বলে ফাস্তোভ আমার হাতে টান দিলে। বললে—ও ইতর ছোকরার কথা তুমি কানে তুলো না। এসো যাওয়া যাক্।

তা বলে তোমাদের ভয় করে না এ-শর্মা। তোমাদের মত ভদ্দর লোকদের সে ঘেন্না করে, শুনে যাও কথাটা। তোমাদের আমি ঘেন্না করি।

উত্তেজিত মানসিক অবস্থায় পথে নেমে ছুটতে লাগল ফাস্তোভ। তার সঙ্গে তাল রেখে চলা আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠল।

হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফাস্তোভ। তারপর মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

আমার কথায় যেন সাড় হল তার।

ঐ ইতরটা যা বললে তা সত্যি কিনা জানতে হবে আমায়—ছোকরা মদের ঝোঁকে যা তা বললে। মিথ্যে কথাই অবিশ্যি—তবু—আচ্ছা, ভাই তুমি যাও। কাল আবার দেখা করব।

আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ফাস্তোভ দ্রুত হোটেলের দিকে

পা বাড়ালে। নির্বোধের মত আমি একা পথে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পরের দিন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল না আমার। তারপরের দিনও যখন তার পাত্তা মিলল না আমার বাসায়, বাধ্য হয়ে তার বাড়িতে গেলাম নিজে। গিয়ে শুনলাম ফাস্তোভ তার আগের দিনই মস্কোর কাছাকাছি এক গাঁয়ে গিয়েছে তার বাবার কাছে। আমার জন্যে কোনো চিঠিপত্র অবধি লিখে রেখে যায়নি সে।

কতদিন দেরী হবে ফিরতে ?

আমার কথায় ফাস্তোভের চাকর যা বললে তাতে বোঝা গেল যে দিন পনেরোর মত বন্ধু আমার বিদেশযাত্রা করেছে । দরকার হলে আরো বেশি দিন হয়ত সে না ফিরতে পারে।

তার কাছেই ফাস্তোভের ঠিকানাটা নিলাম আমি। তাবপর নানা কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম।

এই শীতকালে হঠাৎ এই ভাবে ফাস্তোভের মস্কো থেকে চলে যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে তা আমার মাথায় এল না। তার আচরণে পরিপূর্ণ বিভ্রান্তি ঘটল আমার, তা অস্বীকার করব না।

রাত্রে মাসীমার কাছে খেতে বসে এমন অপ্রস্তুত হলাম যে বলে বোঝাতে পারব না। ফাস্তোভের কথা ভাবতে ভাবতে এমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম যে মাসীমা আমার গায়ে হাত দিয়ে জাগিয়ে না দিলে হয়ত সেইভাবেই বসে আমার রাত কেটে যেত। খাওয়া হত না।

মাসীমার ভ্রূকুটির জবাবে এক মুখ হেসে আমি সান্ত্বনা দিলাম—

না না, তোমার কোনো ভাবনা নেই মাসীমা। প্রেমে পড়িনি আমি। ও বালাই এখনো আসেনি আমার জীবনে। তুমি নিশ্চিন্তে গিয়ে ঘুমোও।

।। ১৬ ।।

মাঝে তিনটে দিন কেটে গেল। একবার সুসানাদের বাড়ি ঘুরে আসার জন্যে মনের মধ্যে জোর তাগিদ অনুভব করতে লাগলাম। আমার কেমন যেন মনে হতে লাগল, যে রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছি আমি ওদের বাড়ি গেলেই তার সমাধান-সূত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু ওর বাবার সঙ্গে দেখা হওয়া চাই।...ভাবনায় বেশ উৎসাহের জোয়ার এল মনে। বেশ মনে পড়ছে।

সেদিন ফেব্রুয়ারীর এক ঝড়লাগা সন্ধ্যা। ক্রুদ্ধ বাতাসের তাণ্ডব নৃত্য চলেছিল বাইরে। বলশালী হাতে ছোঁড়া বালির চাপড়ার মত জমাট তুষার স্তূপ থেকে থেকে জানলার শার্সিতে এসে ঘা দিচ্ছিল। নিজের ঘরে বসে ছিলাম একলা। কি একটা পড়তে চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় চাকর ঘরে ঢুকে রহস্যময় গলায় খবর দিলে কে একজন মহিলা আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। একটু অবাকই হলাম আমি। মেয়েরা সাধারণত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে না। আর বিশেষ করে এই অসময়, রাত্রে। যাই হোক তাকে ঘরে নিয়ে আসতে বললাম চাকরকে।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের বেগে হলদে শাল মুড়ি দিয়ে একটি মেয়ে ঘরে এসে ঢুকল। গায়ে তার একটি মাত্র আচ্ছাদন —তাও গরমকালে পরার। ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি কোট আর শাল গা' থেকে খুলে ফেললে সে। দেখলাম দুটোই ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছে।

তার অঙ্গাবরণ খুলে দাঁড়াতেই দেখলাম আমার সমুখে দাঁড়িয়ে সুসানা। এখন বলতে পারি সেই মুহূর্তে এমন অবাক হয়ে

গিয়েছিলাম যে আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হয়নি। জানলার কাছে গিয়ে দেয়াল ঠেস দিয়ে মৌনমুখা দাঁড়িয়ে রইল সে নিশ্চল হয়ে। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম তার দুটি মধুময়ী স্তনের দুরন্ত ওঠাপড়া। একবার মুখ তুলতেই দেখলাম তার চোখ দুটি অস্থির চঞ্চল। তার দুধআলতা ঠোঁটেব প্রান্ত থেকে যে ক্ষীণ নিঃশ্বাস নির্গত হচ্ছিল তা যেন চাপা কান্নার মত শোনাল আমার কানে। গুরুতর এমন একটা কিছু ঘটেছে যার জন্য সে এইভাবে এখানে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছে, তা বুঝতে আমাব অসুবিধা হল না। আমার অল্পবয়সী যৌবনের অল্প অভিজ্ঞতা সত্বেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এখুনি সব রহস্যের উদ্‌ঘাটন ঘটবে আমার সামনে।

সুসানা, বিহ্বল কণ্ঠে বললাম আমি, তুমি এইবাতে—হঠাৎ ওব হিমশীতল হাতের স্পর্শ পেলাম আমি। কত আগ্রহে সে আমার হাত চেপে ধরল। কি যেন বলতে চাইল সে আমায। কিন্তু তার গলা দিয়ে সামান্য আওয়াজ বাব হল না। শুধু বুকফাটা একটা ভাঙা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে বইল সে। তার ঘন কাল কেশেব ভার স্তবকে স্তবকে তাব চোখে মুখে এসে পড়তে লাগল। সারা মুখখানিই যেন আড়াল হয়ে গেল। সেই চুলে তখনও সাদা সাদা তুষারকণা লেগে রযেছে।

কেন অত উতলা হয়েছ সুসানা। এসে বোসো সোফায়। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে অনুনয় করলাম আমি। বললাম—আমায় বলো কি হয়েছে। আগে বোসো। তারপর ধীরে সুস্থে শুনব।

থাক—অর্ধস্ফুটকণ্ঠে জবাব দিলে সে। সেইখানে জানলার ধারে বসে পড়ল সুসানা। বললে—এইখানেই বেশ আছি আমি। আমাকে এইখানে থাকতে দিন। ...আপনি হয়ত আমাকে এ

সময় আশা করেননি। কিন্তু যদি জানতেন...যদি জানতেন—কিন্তু কেন এমন হল—কেন—

কত রকম করে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু বাঁধভাঙা বন্যার মত চোখের দু'কুল ছাপিযে অশ্রু নেমে আসতে লাগল। সারা দেহ কাঁপতে লাগল থরথর করে। কান্না, বুকফাটা করুণ কান্নায় ঘরের বাতাস যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আমারও বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল—আমি কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। সবশুদ্ধ দুবার মাত্র মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমি জানতাম যে ওর প্রতিদিনের জীবনযাত্রা হয়ত সুখের নয় কিন্তু গরবিনীব মন পাষাণকঠিন। সেই উচ্ছ্বসিত বুকফাটা চোখের জল...উঃ একমাত্র নির্মম মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ বুঝি অমনি ধারা কাঁদতে পারে।

মৃত্যুর-রায়-পাওয়া আসামীর মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

ক্ষমা করবেন আমায়—অশ্রু সংবরণ করার চেষ্টায় অনেকবার চোখ মুছে শেষে বললে সে—এখুনি সামলে নিতে পারব আমি। আপনার কাছে এসেছি... তখনও কাঁদছিল কিন্তু চোখে আর জল ছিল না। অশ্রুহীন তার কান্না।

আমি এসেছি...আপনি জানেন বোধ হয় ফাস্তোভ চলে গেছে।

এই একটিমাত্র কথায় তার সমস্ত বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে গেল। সে এমনভাবে তাকাল আমার দিকে যেন বলতে চায়—আপনি সব বুঝতে পারছেন। আমার দুর্ভাগ্যে আপনার করুণা হবে।

হতভাগিনী। ওর পক্ষে এরকম করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এ-কথার যে কি জবাব দেব আমি ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না।

ফাস্তোভ চলে গেছে। চিরকালের মত চলে গেছে। কিন্তু সব কথা বিশ্বাস করবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করারও দরকার বোধ করল না। সে ভেবেছে আমি বুঝি তার কাছে সত্য গোপন করব। আমার সম্বন্ধে এমন কথা কি করে ভাবতে পারলে সে। কেন? এতদিন আমি কি তার সঙ্গে প্রতারণা করে এসেছি?

ঠোঁট কামড়াতে লাগল সুসানা। তারপর নিচু হয়ে জানালার শার্সিতে জমা তুষার নখ দিয়ে আঁচড়ে আলপনা আঁকতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে চাকরকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে তখুনি ফিরে এলাম। আরো একটা মোমবাতি জ্বেলে দিলাম ঘরে। আমি যে কি করছি সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না আমার। এমনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি।

তখনও সে জানালার ধারে তেমনিভাবে বসে ছিল। এতক্ষণে আমার নজরে পড়ল সে কত সামান্য কত হালকা পোশাক পরে এসেছে। সাদা বোতাম লাগানো ছাই রংয়ের একটা গাউন। কোমরে চামড়ার বেল্ট। পোশাক বলতে এই। আমি ওর কাছে সরে গিয়ে দাঁড়ালাম, তা সে লক্ষ্যও করলে না। আপন মনেই বলতে লাগল—এ কথা কি করে বিশ্বাস করলে—কি করে বিশ্বাস করতে পারলে?

ঐ এক কথা কতবার করে উচ্চারণ করলে মেয়েটি। নিজের প্রশ্নের জবাবে অল্প করে তার শরীর দুলতে লাগল—একটুও তর সইল না। আমাকে সে শেষ আঘাত—চরম আঘাত করে গেল।

হঠাৎ সে আমার দিকে ফিরে বললে—-আপনি জানেন তার ঠিকানা?

জানি। ওদের বাড়ির চাকরদের কাছ্ থেকে জেনে নিয়ে এসেছি। কিন্তু ফাস্তোভ তার সংকল্পের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি আমাকে। তুদিন ওর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় ওদের বাড়িতে খবর নিতে গিয়েছিলাম। শুনলাম—ও মস্কো চলে গেছে।

আপনি জানেন তার ঠিকানা?—যেন একটা আশ্রয় পেলে বিরহিণী। অধীরকণ্ঠে বললে—তাহলে আপনার বন্ধুকে লিখে দিন—ও আমাকে মেরে ফেললে। আমি জানি আপনি খুব ভাল লোক। আমার সম্বন্ধে ও হয়ত কিছু বলেনি আপনাকে কিন্তু আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি ওর মুখ থেকে। আপনি দয়া করে লিখে দিন—লিখে দিন এই অভাগিনীর জবানীতে। আমায় যদি দেখতে চায় সে. যেন শিগগীর ফিরে আসে। কিংবা কি জানি—আমায় ও আর জীবন্ত দেখতে পাবে না।

প্রতিটি কথার সঙ্গে ওর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ও নিজেও শান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু কান্নাব চেয়ে তার চিত্রার্পিত শান্ত মূর্তি আমাকে বেশি বিক্ষুব্ধ করে তুলল।

ভিক্টরের কথাই বিশ্বাস করলে সে। হাতের উপর থুতনি রেখে ও চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ।

হঠাৎ একটা হাওয়ার ঝাপট তীক্ষ আওয়াজ তুলে জানালার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে তুষার পাতের শব্দ। ঘরের মধ্য একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। কেঁপে উঠল বাতির আলো। আর সেই সঙ্গে তার সারা শরীর শিউরে উঠল।

আবার আমি ওকে সোফায় বসবার জন্য অনুরোধ করলাম।

না, না, যেখানে আছি সেখানেই থাকতে দিন আমায়। দয়া করে থাকতে দিন—

জানলার শার্সির গায়ে আরো জড় সড় হয়ে বসল সে।

শীতে কাঁপছে তোমার শরীর—মিনতি করলাম আমি—জুতো ভিজে সপসপে। তুমি যে জমে যাবে এই ঠাণ্ডায় বরফে।

আমার দিকে আর তাকাবেন না। এই আমি বেশ আছি।

কাতর মিনতি জানাল সুসানা। ধীরে ধীরে ওর চোখের পাতা ছুটি বুজে এল। দেখে একটা অশরীরী আতঙ্ক গ্রাস করল আমায়।

সুসানা—আমি যেন প্রাণের তাগিদে চেঁচিয়ে উঠলাম। বললাম—অমন পাথরের মত বসে থেকো না তুমি। এস, উঠে এস। তোমায় মিনতি করছি। উঠে এসে সোফায় বস। এত হতাশ হয়ে পড়ছ কেন? একটা সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে মাত্র। জলভরা মেঘ চিরদিন থাকবে না। মেঘ কেটে যাবে। ফাস্তোভ ফিরে আসবে। সব কথা পরিষ্কার করে লিখে আমি তাকে চিঠি দোব। তবে তুমি যে কথা বললে তা আমি লিখতে পারব না। ও কথা আমার কলমে আসবে না।

আমায় আর সে দেখতে পাবে না—তেমনি স্তিমিতকণ্ঠে ফিস ফিস করে বললে মেয়েটি—যদি না জানতাম যে পৃথিবীতে আমার বাঁচার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তাহলে কি একজন অপরিচিত লোকের কাছে এমনিভাবে অন্ধকার রাত্রে ছুটে আসতাম। আমার অতীত ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সে সব দিন আর ফিরে আসবে না। মরতে বসেছি আমি। সর্বনাশ যা হবার তা হয়েই গেছে। কাউকে একথা না বলে আমি কিছুতেই মরতে পারতুম না। তাই আপনাকে এমন করে দুঃখ দিতে এলাম।

অন্ধকার রাত্রির পটভূমিকায় তুষারঢাকা শার্সির ম্লানাভ আলোয় সেই মুখ, সেই বিষাদ মূর্তি আমি জীবনে ভুলব না। তার সেই

নিথর চোখের নির্বাপিত জ্যোতি—শ্বেতপাথরের তৈরী সেই মুখ খানির বিষণ্ণতা ঘিরে ঘন কালো অবিন্যস্ত কেশপাশ—আমি জীবনে ভুলতে পারব না। তার সেই জড়ো হয়ে বসা দেহটিকে ঘিরে পরনের ছাই রঙের পাতলা গাউনটার ভাঁজগুলি মনের পরতে পরতে অক্ষয় দাগ রেখে গেছে। আমি ত জানতাম ঐ স্তিমিত দেহের অন্তরালে একটি অনুরাগবিধুর তরুণ প্রাণ স্পন্দিত। যে প্রাণ ভালবাসার কাঙালিনী। প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে যে প্রাণ বিপ্রলব্ধা।

নিজের অজ্ঞাতেই আমি দুই-হাতে প্রতিবাদ জানালাম। বললাম—মরবার কথা কেন বলছ সুসানা। মরতে তুমি পাবে না। তোমায় বাঁচতে হবে। বাঁচতেই হবে।

একথা শুনে সে আমার দিকে দৃষ্টিপ্রদীপ তুলে ধরলে। আমার কথায় তার বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রইল না যেন।

আপনি জানেন না। অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুটি ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে বললে সে—আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। বড়ো দুঃখের জীবন আমার। সারাটা জীবন ধরে কেবল দুঃখের বোঝা বয়ে চলেছি। কিন্তু এত দুঃখেও বেঁচে ছিলাম—শুধু একটি আশা তরুকে আশ্রয় করে। কিন্তু যখন সেই আশ্রয়ও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল—

বলতে বলতে সে ঘরের ছাতের দিকে চাইলে একবার। তারপর আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। আর কথা কইল না। গভীর বেদনা ও বিরক্তির যে রেখা ওর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছিল, তখন ওর সর্বাঙ্গে তা বিস্তৃত হয়ে গেল। বিষণ্ণ মেদুর হয়ে এল কোমল মুখখানি। ওকে দেখে মনে হল যেন কোন পাষাণ

প্রতিমা। যার শরীরের রেখায় অবিনশ্বর বেদনাকে মূর্ত করে তুলেছে কোনো জীবনশিল্পী।

মেয়েটি তখনও তেমনি আচ্ছন্নের ঘোরে ছিল। সেই দম-আটকানো নৈঃশব্দ্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আমি বললাম—

শোন সুসানা। আমি বলছি ও ফিরে আসবে।

শুনে আমার দিকে শূন্যগর্ভ শীতল দৃষ্টিতে চাইলে বিরহিণী।

কি বলছেন?

যেন কত চেষ্টা করে বললে কথা কটি।

আমি বলছি তোমার ফাস্তোভ ফিবে আসবে। নিশ্চয় ফিরে আসবে।

ফিরে আসবে বলছেন? কিন্তু ফিবে এলেও এই অপমান অবিশ্বাসের জন্য আর ত তাকে ক্ষমা করতে পাবব না।

ও অস্থির আবেগে দু' হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল।

হায় ভগবান। এসব আমি কি বকছি। কেন আমি এলাম এখানে? কেন এ বিড়ম্বনা। কিসের আশায় এসেছি। কেন, কেন? সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি পাগল হয়ে গেছি।

ওর দৃষ্টি আবার যেন নিথর হয়ে এল।

ফাস্তোভকে চিঠি লেখার কথা বলতে এসেছ—আমি তাড়াতাড়ি ওকে মনে করিয়ে দিলাম।

চমকে উঠল সুসানা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—লিখে দিন তাকে—যা মন চায় লিখে দিন।

এই বলে ও তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢুকিয়ে অনেকগুলো হাতে লেখা কাগজ বার করলে।

এটা তার জন্যেই লিখেছিলাম—। তার চলে যাবার অনেক আগে থেকেই লিখছিলাম—কিন্তু সে ওরই কথা বিশ্বাস করলে। পরখ করলে না, খতিয়ে দেখলে না, বেদবাক্য বলে মেনে নিলে।

ও যে কার কথা বলছে তা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধা হল না। ভিক্টরকে ও এত ঘৃণা করে যে তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করলে না।

কিন্তু ফাস্তোভের সঙ্গে তোমার ভাইয়ের এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছে এ কথা ধরে নিচ্ছই বা কেন ?

ধরে নোবো কেন ? ও ত বাড়ি এসে নিজেই আমাকে সব কথা বলেছে। গলা ফুলিয়ে খুব দম্ভ করলে তা নিয়ে। ওর বাপ যেমন হাসে তেমনি করে সেও হাসলে।

পাণ্ডুলিপিটি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সুসানা বললে—এটা নিন, পড়ে দেখবেন। ওকে পাঠিয়ে দিন, পুড়িয়ে ফেলুন, ফেলে দিন যা ইচ্ছা করতে পারেন। কিন্তু এভাবে কাউকে কোনো কথা না জানিয়ে মরতে আমি পারব না।...সময় হয়ে এসেছে—এবার আমাকে যেতে হবে।

ও যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল দেখে আমি ওকে বাধা দিলাম।

এখন কোথায় যাবে ? বাইরে ভীষণ তুষার ঝড় হচ্ছে। তাছাড়া তোমার গায়ে গরম জামা নেই। অনেকটা পথ যেতে হবে। দাঁড়াও অন্তত আমি একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করি।

না না আমি কিছু চাই না—মেয়েটা যেন মরীয়া হয়েই নিরস্ত করলে আমাকে। তারপর শাল আর কোট হাতে তুলে নিল।

দোহাই আপনাকে, আমায় বাধা দেবেন না। সব কিছুর জবাবদিহি করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমার পায়ের তলায়

গভীর অন্ধকার খাদ। আমার কাছে আসবেন না—স্পর্শ করবেন না আমায়।

বিকারগ্রস্ত রোগীর অদ্ভুত ত্রস্ততায় সুসানা শালটা গুছিয়ে নিলে। তারপর বললে—বিদায়—চিরবিদায়। আমার আত্মীয় বন্ধু সকলের কাছে চিরদিন আমি অপরিচিতই রয়ে গেলাম। কাউকে চিনলাম না। ভগবানের অভিশাপ আছে আমাদের ওপর। আমার জন্যে কেউ কোনদিন মাথা ঘামায়নি। ভালবাসা পাইনি। সেও ভালবাসেনি—এই বলে হঠাৎ থামল সে—না না কেউ আমায় ভালবাসেনি কোনদিন। হাত মোচড়াতে মোচড়াতে আবার বললে সে—আমার চারিদিকে মৃত্যুর গণ্ডী—মুক্তি কোথাও নেই। এবার আমার পালা পড়েছে। আমার পিছু পিছু আসবেন না যেন—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল সে—আসবেন না বলছি। আসবেন না।

আমি কেমন যেন ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সুসানা ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুহূর্ত পরেই বাইরের ভারী দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেলাম। ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটায় জানলাগুলো থর থর করে কেঁপে উঠল।

সম্বিৎ ফিরে পেতে বেশি দেরী হল না আমার। জীবনের যাত্রাপথে তখন সবে পা বাড়িয়েছি। প্রেম কি তাই জানতাম না। প্রেমের দুঃখ কেমন তা আমার যৌবন তখনো জানেনি। কোনো মেয়ের অনুরাগবিরাগের পরিচয়ও পাইনি তখনো। কিন্তু সেদিন যা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য হল তার অকপটতা আমার মনের মণিকোঠায় চিরসঞ্চিত হয়ে রইল। পাণ্ডুলিপিটি যদি হাতে না থাকত তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই স্বপ্নেদেখা ঘটনা বলে মনে করতাম। আদ্যন্ত সবকিছুই কেমন যেন অবাস্তব অসম্ভব মনে হতে

লাগল। বুঝি বা হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেছে ঘরের মধ্য দিয়ে। মাঝ রাত অবধি জেগে সেই পাণ্ডুলিপি পড়লাম। চিঠির কাগজের পাতায় ঠাসবুনানি লেখা। কোনো লাইনটিই সমান্তরাল নয়। দেখলেই মনে হবে, যে-হাত দিয়ে লেখা হয়েছে সে-হাত গভীর উত্তেজনায় কেঁপেছে সারাক্ষণ। পাণ্ডুলিপিতে যা লেখা আছে তা এই। আজ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিটি আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

॥ ১৭ ॥

এ বছর আমি আটাশে পড়েছি। শিশুকালের কথা যতটুকু মনে পড়ছে এই সঙ্গে লিখে রাখছি।

এক মস্ত জমিদার বাড়িতে তখন আমরা থাকতাম। গ্রামের ভিতর সেই বাড়ির তেতালার একখানা ছোট্ট কুঠুরী ছিল আমার শৈশবের আশ্রয়নীড়। মাকে মনে পড়ছে আমার। তিনিও আমার সঙ্গে থাকতেন। মা আমার জাতে ইহুদী ছিলেন। আমার দাদু ছিলেন শিল্পী। ছবি আঁকার নেশায় ঘুরতে ঘুরতে মেয়েকে নিয়ে তিনি এদেশে এসে পড়েন। দাদুকে আমি দেখিনি। আমার যখন জ্ঞান হয় তখন তিনি এ পৃথিবীর রূপলোক থেকে আর এক অপরূপ লোকে গিয়ে পৌঁছেচেন। মাকে আমি চিররুগ্না দেখেছি। তার মুখখানি ছিল ভারী সুন্দর। কিন্তু সেই মুখ ছিল মোমের মত ফ্যাকাশে। তার আয়ত চোখের আকাশ দুটি কেমন যেন একটা দুঃখের মেঘে থম থম করত সব সময়। ঐ দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি মেলে মা যখন আমার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকতেন আমি তার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারতাম ঐ চোখ দুটি কী এক গভীর

বেদনায় থর থর করে কাঁপছে। কী অপার দুঃখ নিঃশব্দে ঝরে পড়ত ঐ চোখ দুটি থেকে। সে-বেদনার আর্তি বোঝবার বয়স ছিল না তখন আমার। কিন্তু মার কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমারও কান্না পেয়ে যেত। ছুটে গিয়ে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম আমি।

মাষ্টার এসে বাড়িতে পড়িয়ে যেতেন আমায়। গানবাজনা শিখতাম। বাড়িতে যথাযোগ্য আদরযত্ন ছিল। কারুর কাছ থেকে অনাদর পাইনি কখনো। খাবার সময় মনিবও থাকতেন টেবিলে। জমিদারবাবু ছিলেন দীর্ঘকান্তি সুপুরুষ মানুষ। বয়স হলেও তাঁর সারা চেহারায় একটা রাজকীয় আভিজাত্য জমজম করত। কাছে গেলেই তাঁর গা থেকে কি একটা মিষ্টি গন্ধ ভুর ভুর করে নাকে এসে লাগত। তাঁকে দেখলে ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে যেত। কেন যে অত ভয় হত জানি না। কিন্তু তিনি আমায় কখনো আদর না করে কথা বলতেন না। সুজান বলে আদর করতেন আমায়। তাঁর শিরাউপশিরা কণ্টকিত শুক বাহুতে চুম্বন করতে দিতেন তিনি আমায়। কিন্তু তবু আমার ছেলেমানুষী ভয় যেত না। মায়ের সঙ্গে তিনি খুবই মিষ্টি ব্যবহার করতেন। কিন্তু কথাবার্তায় মানুষটি ছিলেন অতি মিতবাক। তিনি হয়ত মিষ্টি করে দু' একটি প্রশ্ন করতেন। মা কোন মতে জবাব দিয়ে যেন রেহাই পেতে চাইতেন। তারপর কথা ফুরিয়ে যেত। তখন নিঃশব্দের পালা পড়ত। নিজের চারিপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি মস্ত জমিদারী মর্যাদায় সোনার নস্যির কৌটা থেকে এক টিপ নস্যি নিয়ে মৌতাত করতে থাকতেন। ঘরের ভেতর একরাশ চুপচাপ থমকে এসে দাঁড়াত।

তখন আমার ন'বছর বয়স। সেই সময় এক আশ্চর্য খবর শুনলাম আমি। বাড়ির ঝিয়েদের মুখে শুনতে পেলাম যে আমি নাকি

যে সে বাপের মেয়ে নই। স্বয়ং জমিদার মশায় আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেব। এর চেয়ে অবাক করা খবর আর কি হতে পারত সেদিন। তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হওয়া আমার বাকী ছিল তখনো। এই প্রফেসর যার কাছে আমি এখন রয়েছি তিনি তখন ছিলেন জমিদারের খাস খানসামা। আমার বাবার হুকুমে সেই দিনই এই লোকটার সঙ্গে মায়ের মন্ত্র পড়ে বিয়ে হোল।

একি হোল, মনে মনে ভাবতে লাগলাম আমি। এমন যে কখনো হতে পারে তা আমার ন বছরের শিশু মন কখনো কল্পনাও করতে পারত না। মা আমার ছিলেন। বাবা আমি পেয়েছিলাম। তিনিও আমার আর দশজন ছেলেমেয়ের বাবার মত সাদামাটা নন। মস্ত জমিদার। সুপুরুষ। যার চোখের দিকে তাকিয়ে অন্য সবাই সম্ভ্রমে চোখ নামিয়ে নেয়। তিনি কি করে এমন হুকুম দিলেন ভেবে কুলকিনারা পাইনি সেদিন। তিনি থাকতে একটা খানসামার সঙ্গে মায়ের আবার বিয়ে হোল এ-কথা ভেবে আমার মন যেন ঘোলাটে কুয়াশায় দিশেহারা হয়ে গেল। এই অন্ধকারে মাকে হারানোর আশঙ্কায় আমি তার আশ্রয়েই ছুটে গেলাম।

এ কি সত্যি মা। বলো না, একি সত্যি? মাকে আমি জিজ্ঞেসা করলাম—গায়ে বোটকা গন্ধ ঐ দৈত্যটা নাকি আমার বাবা হবে?

আমার কথা শুনে ভয়ে আঁতকে উঠলেন মা। থর থর কাঁপা দু'খানি হাত চাপা দিলেন আমার মুখে। যেন কত মিনতি করে বললেন—লক্ষ্মী মা আমার, ও কথা আর কখনো বোলো না। কাউকে বোলো না—তার নরম বুকের মধ্যে আমায় চেপে ধরে ধরা গলায় বার বার ঐ এক কথা উচ্চারণ করতে লাগলেন মা।

মা'র সেই বারণ আমি কোনোদিন অমান্য করিনি। সে কথা আমি কখনো কাউকে বলিনি। যত ছোটই হইনা কেন, মায়ের সেই নিষেধের কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম কিনা। বুঝেছিলাম যে চুপ করে থাকাই আমার একমাত্র কাজ। মা ত মিছিমিছি আমায় বলেননি সে-কথা। সেই বোবা চাহনিতে মিনতি ছিল আজ তা বুঝতে পারছি। কিন্তু সেদিনও যে বুঝিনি তা নয়। আর সেইদিন থেকে আমার দুঃখের পালা পড়ল।

জমিদারের হুকুম তামিল হোল। বিয়েও হয়ে গেল। কিন্তু প্রফেসর একদিনও মাকে একটুও ভালবাসত না। মাও ওকে দেখতে পারতেন না। লোকটা টাকার লোভে মাকে বিয়ে করেছিল। আর কি জানি কেন আমার দুঃখিনী মা এ বিয়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাবা হয়ত ভেবেছিলেন এই ভাবেই তিনি সবদিক মানিয়ে দিতে পারবেন।

মনে আছে বিয়ের আগের দিন মা আর আমি গলা জড়াজড়ি করে অনেক কেঁদেছিলাম। সারা সকাল অঝোর কান্না কেঁদেছিলাম মায়েঝিয়ে। নিঃশব্দে, আকুল হয়ে কান্নায় গলিয়ে দিয়েছিলাম নিজেদের। মা যে নিঃশব্দে এ ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলেন, আমাকে একটি কথাও বলেননি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তখন আমার কী-ই বা বয়স। কী-ই বা তিনি বলতে পারতেন আমাকে? সেদিন মাকে যে আমি একটি প্রশ্নও করিনি তার ভিতর থেকে একটা পরম সত্য বড়ো আশ্চর্যভাবে প্রমাণিত হয়। দুঃখী ছেলেমেয়েরাই সংসারে তাড়াতাড়ি সেয়ানা হয়ে ওঠে। যারা সুখের ঘরে মানুষ হয় তাদের চেয়ে ঢের আগে।

মায়ের দ্বিতীয়বার বিয়ে হল বটে, কিন্তু আমার বাবা আগের

মতই আমার শিক্ষায় সমান উৎসাহ দেখাতে লাগলেন। শুধু তাই নয়। এতদিন আমায় স্নেহ করতেন আচার আচরণে ক্বচিৎ কদাচিৎ। এখন ধীরে ধীরে তিনি যেন আমায় আপনার করে নেবার জন্যে একান্তভাবে মনোনিয়োগ করলেন। কথা অবশ্য বেশি বলতেন না কোনদিনই। কিন্তু প্রতিদিন সকালসন্ধ্যা আঙ্গুলের নস্যি নাকের ভিতর দিয়ে সেই আঙ্গুল ঝেড়ে নিয়ে আমার গালে টোকা মেরে আদর করতেন আমায়। কী ঠাণ্ডা হিম ছিল সেই ছোঁয়ায় এখনো যেন আমার গালে তার স্পর্শ পাই। কখনো কখনো স্নেহসিক্ত মুখে কি মিষ্টি খেতে দিতেন আমায়। সে সব মিষ্টিতে কি এক রকম গন্ধ ভুর ভুর করত বলে, সেগুলো মুখে দিতে রুচি হোত না আমার।

বার বছর বয়সে আমি তাঁর বই পড়ার একমাত্র সঙ্গিনী হয়ে দাঁড়ালাম। গত শতাব্দীর ফরাসী মনীষীদের লেখা সাহিত্য থেকে পড়ে শোনাতে হোত তাঁকে। কিন্তু যা পড়তুম নিজে তার বিন্দু বিসর্গও বুঝতাম না। মানুষটি পুরোপুরি ফরাসী ছিলেন। বিপ্লব পর্যন্ত তিনি প্যারিসেই বসবাস করেছিলেন। ফ্রান্সের হতভাগিনী রানী মেরী আতাঁয়োর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে-কালের প্যারিসের সম্ভ্রান্ত মেয়েপুরুষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল খুবই। কিন্তু তা নিয়ে কখনো আত্মগরিমা প্রকাশ করতে শুনিনি তাঁকে। মানুষটির মধ্যে যে একটি সত্যিকার অভিজাত ছিল তা আবিষ্কার করার মত বুদ্ধি আমার সেই বয়সেই হয়েছিল।

মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁর যৌবন যায়নি। সে সুন্দর শরীরে জরা স্পর্শ করতে পারেনি কোনদিন। গাল-দুটিতে গোলাপী আভা ছিল অম্লান। দাঁতগুলি ছিল মুক্তার মত। এক জোড়া মোটা ভুরু ছিল যেন ঘন

তুলিতে আঁকা। অপূর্ব ভাবময় দেখতে পরিষ্কার টলটলে চোখের কালো মণি দুটি। আর সেই চোখের দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ত স্নিগ্ধ প্রসন্নতা।

আমার বাবার চরিত্রে কোথাও খুঁত দেখিনি কোনদিন। তাঁর সৌজন্য বোধ ছিল অতি প্রখর। এমন কি চাকরবাকরদের সঙ্গে পর্যন্ত তিনি সম্ভ্রম ভরা ব্যবহার করতে কার্পণ্য করতেন না। কিন্তু আমার কি যে হোত। সেই মানুষটির কাছে বসে কি যে বিশ্রী লাগত আমার। তার কাছ থেকে যখন চলে আসতাম সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রফুল্লতা ফিরে আসত। আর ওঁর সামনে এলে নানা কুৎসিত চিন্তায় মন ঘুলিয়ে উঠত। কিন্তু এর জন্য কি একা আমিই দায়ী ছিলাম। ঐ সব ভালো লোক একটি কিশোরী মেয়ের জীবন নিয়ে যেভাবে ছিনিমিনি খেলেছিলেন তার কথা মনে পড়ছে আমার। তাদের জন্যেই ঐ কুশ্রীতা এসে বাসা বেঁধেছিল আমার মনে।

বিয়ের পর জমিদার বাড়ি থেকে অল্প দূরে একখানি বাসায় এই প্রফেসরের থাকার ব্যবস্থা হোল। মায়ের সঙ্গে আমিও চলে এলাম সেখানে। সে এক নিরানন্দ জীবনের বোঝা বয়ে বেড়ানো। এরই অল্প কিছুদিন পরে আমার মা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। সেই ছেলেরই নাম হোল ভিক্টর। এই ভিক্টরই আমার চিরশত্রু। তাকে যে শত্রু ভাবি তাও অকারণ নয়। ভিক্টরের জন্মের পর মায়ের স্বাস্থ্য আরো ভেঙ্গে পড়ল। মায়ের আমার স্বাস্থ্য কোনদিনই ভালো ছিল না। কিন্তু এ ভাঙ্গা স্বাস্থ্য আর জোড়া লাগল না কোনোদিন। আজকাল প্রফেসর যেমন সদাপ্রফুল্ল হাসিখুশি জীবনযাপন করছেন, তখন তা করত না নানা কারণে। এমন ভাব দেখাত সব সময় যেন তার মনে সুখ নেই। কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে ঘুরে বেড়াত সারাদিন।

গোমরা মুখে সর্বদাই এমন একটা ব্যস্ততার ভাব থাকত যেন কত খাটতে হচ্ছে তাকে।

আমার উপর ছিল তার জাত আক্রোশ। ছুতোনাতায় আমার সঙ্গে রূঢ় নির্দয় ব্যবহার করা যেন তার দিনরাত্রের অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জমিদারের চোখের আড়াল হতে পারলে যেমন খুশি হতুম তেমনি এ বাড়িটা ছেড়ে বাইরে থাকতে পারলেও মন খুশিতে ভরে যেত। আমার সে নতুন যৌবন দিন বড়ো দুঃখেই কেটেছিল। খালি এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে ভেসে বেড়িয়েছি—কোথাও নোঙর ফেলার ইচ্ছা হত না। শীতকালে পাতলা একটা ফ্রক পরে তুষার জমা উঠোন পেরিয়ে ছুটে যেতাম বড় বাড়িতে জমিদারকে বই পড়ে শোনাতে। যেন আনন্দ আহরণ করতেই ছুটে আসতাম...কিন্তু সেখানে এসে যেই বিরাট বিরাট নিরানন্দ কক্ষগুলি দেখতাম মনের সেই সহজ উল্লাস কোথায় অবগুণ্ঠিত হয়ে যেত। চোখে পড়ত গলায় গলাবন্ধ আঁটা সেই মূর্তিটি। সিল্কের ঢিলে আলখাল্লা পরে সেই হৃদয়হীন ভালো মানুষটি বসে আছেন। জামার লেসগুলো আঙুলের ডগা অবধি পৌঁচেছে, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো—কর্পূরের ভারী গন্ধে আমার দম আটকে আসত, বুক দমে যেত। একটি নিচু চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে থাকতেন তিনি। পিছনের দেওয়ালে একটা বড়ো ছবি ঝুলত। এক ঝলকে চোখে পড়ত বহুমূল্য পোশাকে ঢাকা সেই সুন্দরী তরুণীর সর্বাঙ্গের ঝলমল রূপ। মুখে তার অপূর্ব উজ্জ্বল নির্ভীক দীপ্তি। গায়ে দামী হীরেমুক্তোর অলঙ্কার মোড়া। ঐ ছবিখানি দেখতে কি যে ভাল লাগত আমার। কতবার লুকিয়ে লুকিয়ে ছবিটার দিকে চেয়ে দেখেছি। তখন জানতাম না ত কে সেই আমার অজানা মেয়ে। ভারী আশ্চর্য

লাগত ভাবতে যে ঐ ছবিখানির দিকে আমার এত আসক্তি হবার কারণ কি ? কে আমার উনি ? কি সম্পর্ক আছে যে এমন করে আমায় সে টানে। তখনকার অবুঝ ছেলেমানুষী মন নিয়ে একথাও ভেবে কুলকিনারা করতে পারিনি, কেন ঐ বৃদ্ধ তাঁর বিগতযৌবনের আসক্তিতে ঐ স্মৃতির মায়া আঁকড়ে পড়ে আছেন। ভেবেছি বটে কিন্তু নিজের মনের মধ্যে কোনো উত্তর পাইনি কখনো। পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে ঐ ছবিখানি আমার মায়েরই। যুবক জমিদারের অনুরোধে আমার জাত আর্টিষ্ট দাদামশাই এঁকেছিলেন তাঁর মেয়ের ছবি। তারপর মায়ের চৈত্রফাল্গুনের জোয়ার ভাঁটা। আর চেনবার উপায় নেই সে মানুষটাকে আজ। সেই বয়সের ছেলেমানুষী মন নিয়ে কতবার ভেবেছি আমার মায়ের বিগত জীবনের কথা। ঐ যে মানুষটি পাথরের মূর্তির মত বসে আছে, তার হাতের পুতুল ছিল ঐ ফুলের মত অপাপবিদ্ধ রূপবতী মেয়ে। মমতাহীন হাতে কত ছলে ছলনায় তাকে বশ করেছে। জয় করেছে কোন দুর্বল মুহূর্তে। তার পর দিনে দিনে তার রূপ রস নির্যাস শুষে নিয়েছে। দস্যুতা করেছে তার যৌবনের ঘরে। তারপর ফেলে দিয়েছে ছুঁড়ে অবহেলে। তবু মা ওকে ভালবাসতেন। ভালবাসতেন বৈকি, মনে মনে ভাবতাম আমি। ভাবতে সর্বাঙ্গ আমার শিউরে উঠত। ভাবতাম, এ কি করে সম্ভব। কি করে মা ভালবাসতে পেরেছিলেন ঐ বুড়োটাকে। তবু যখন মায়ের চোখের চকিত চাহনি দেখতাম, তার মুখের আধো উচ্চারিত দু' একটি কথার টুকরো ছিটকে আসত কানে, দেখতুম তার হঠাৎ বিহ্বল হওয়া শরীরের কোনো উন্মীলিত মাধুরী, তখন আর সন্দেহ থাকত না। ঐ বৃদ্ধের কথা জানি না কিন্তু মা আমার যে পুরোনো দিনের স্মৃতি মণি কোঠায় সযত্নে আড়াল করে

রেখে আছেন আনন্দে, সে কথা সত্যি। তখন মনে হোত, হ্যাঁ মা ওকে ভালবাসতেন বই কি! এ সত্য নিজের মনে মেনে নেওয়া যে কতখানি মর্মান্তিক তা, যে আমার অবস্থায় না পড়েছে সে বুঝবে না। মনে মনে নিরন্তর প্রার্থনা করি, হে ভগবান, নিজের মায়ের সম্বন্ধে এমন অশুচি চিন্তা যেন কোনো মেয়েকে কোনোদিন না ভাবতে হয়।

জমিদারবাবুকে রোজই বই পড়ে শোনাতেম আমি। কখনো কখনো একটানা তিন চার ঘণ্টা পর্যন্ত চলত পড়াশোনা। এতক্ষণ ধরে অত চেঁচিয়ে পড়া আমার কণ্ঠের পক্ষে ক্ষতিকর দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জানতে পেরেই ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। ডাক্তারেরা আমার ফুসফুস সম্বন্ধেও ভয় দেখিয়ে গেল মনে আছে। বাবাকেও তারা জানিয়েছিলেন তাদের আশঙ্কার কথা। কিন্তু শুনে তিনি স্মিত হেসেছিলেন শুধু। পাথরের মুখে সে হাসি, মানুষের মুখে নয়। তাকে হাসি বললে ভুল বলা হয়। ভাবলেশহীন সেই মুখখানি শুধু পলকের জন্য দীপ্ত হয়ে উঠল। অধরওষ্ঠে একটু কোথায় বিচ্যুতি ঘটল। চকিতের জন্য মনে হোল যেন ডাক্তারের কথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন তিনি।

তারপর ডাক্তারকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—তোমার কোনো ভয় নেই হে ডাক্তার। আগে কি ছিল তার জন্যে মাথা ঘামাবার কোনো কারণ নেই। এখন সে সবের আর বালাই নেই—

কিন্তু পড়া আমার বন্ধ হয়নি। তেমনিভাবেই পড়ে শোনাতে হোত তাঁকে। রাত্তিরে আর ভোরবেলায় কাসিটা বড্ড বেড়ে যেত। কখনো কখনো তাঁর খেয়াল হলে আমাকে পিয়ানো বাজাতে বলতেন। বাজনার সুর যেন তাঁর শরীর মনে ঘুমের যাদু বুলিয়ে দিত। অলস

আলস্যে চোখ দুটি বুজে আসত, সুরের ছন্দিত তালে তালে দুলত মাথা। বাজাতে বাজাতে যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তিনি আমাকে একটু হালকা সুরা পান করতে দিতেন।

এমনি করে আমার নিরানন্দ ভুবনে দিনরাতের পালা চলেছিল।

তারপর সেই রাত এল আমার জীবনে। সে ত শুধু অন্ধকার রাত নয়, সেই অন্ধকারে আমার জীবনে অবিস্মরণীয় বিপর্যয় ঘটে গেল।

হঠাৎ মা আমার মারা গেলেন। তখন আমি সবে পনেরোয় পা দিয়েছি। সে-দুঃখ মানুষের ভাষায় বলবার না। যেন হিংস্র শ্যেনপাখার মত নিষ্ঠুর নিয়তি আমার জীবনকে মাতৃক্রোড় থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে এক দয়াহীন সংসার আবর্তে।

মৃত্যুর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। আজ মনে পড়ছে কী এক সর্বনাশের সুচনায় সে রাত্রে বড়ো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। মা, আমার দুঃখিনী মাকে জীবনে আর দেখতে পাব না। এ কথা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়নি মন। আজ ভাবছি কি অবিশ্বাসীই না ছিল আমাদের মা মেয়ের সম্পর্ক। মায়ের আমার ভালবাসার কী আর সীমা ছিল! তাকেও আমি বড়ো ভালোবাসতাম। আমার ত মা বই আর কেউ ছিল না জীবনে। আমাদের সে ভালবাসা ছিল পাহাড়ী নদীর মত আপন আবেগে দুরন্ত। কিন্তু তার মধ্যে প্রতি-দিনের নৈরাশ্য জয় করার জোর ছিল না। কোথায় একটা বাধার পাহাড় ছিল, যা আমরা ঠেলে সরাতে পারতাম না। কত কি ছিল আমাদের মধ্যে, যা বলা যেত না। মনের তটে যতবার কূলপ্লাবী ঢল আসত নেমে, মুখে তাকে কিছুতেই প্রকাশ করার সাহস হত না।

মায়েরও হোত না, আমারও হোত না। তাই কোনো কিছুতেই আমরা কেউ কাউকে প্রশ্ন করতাম না কোনোদিন। বোধ হয় নির্বাক থাকাটাই স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছিলাম। মনের আগুন মনেই জ্বলত।

মা তার অতীত জীবনের কথা কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেননি আমায়। সে সম্বন্ধে কোনোদিন কোনো নালিশও শুনিনি তার মুখে। অথচ তার সমস্ত চেহারাটিই ছিল অভিযোগের একটি বাণীহারা প্রতিমা। সংসারের কোনো সমস্যা-কীর্ণ বিষয় নিয়ে কোনোদিন মায়ের সঙ্গে আলোচনা করিনি। ভয় হত পাছে মায়ের সঙ্গে আমার মনের সহজ স্নেহের সুরটি কোথাও কেটে যায়। সে সম্ভাবনাকে বড়ো ভয় করতাম আমি। মাও বোধ হয় করতেন। মনে মনে ভাবতাম এমন একদিন আসবে যে দিন মা নিজের থেকেই দুয়ার অবারিত করবেন আমার কাছে। সেদিন আমিও আমার কোনো কথা গোপন রাখব না। দুজনেই দুজনের হৃদয়ের গোপন মহল উদ্ঘাটিত করে দিয়ে সহজ হব। মাকে আমার সত্যিকার আপন করে পাব।

কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিতে কোনো কথাই বলা হোল না। মায়ের সেই চাপা স্বভাব আর অসুস্থ দিনরাত্রি সে-সব কথাকে চিরদিনের মত অবলা রেখে দিয়ে গেল। আর এই প্রফেসর! যতবার মায়ের সঙ্গে নির্জন হয়ে বসেছি, ভেবেছি হয়ত এবার মাকে পাবো আমার অন্তরঙ্গ আশ্রয় করে, ঐ প্রফেসর এসে দাঁড়িয়েছেন। তাছাড়া মায়ের আমার সেই এক কথা ছিল মুখে—কি আর হবে? সবই ত গেল। বলা হয়ে ওঠেনি।

এমনি করে দিনে দিনে ফুরিয়ে গেল দিন। আয়ুর জীর্ণ তরণী চলমান জলস্রোতে কোথায় কোন মহাঅন্ধকারে হারিয়ে গেল। ফুরিয়ে গেল সব। একটি মাত্র অশনি আঘাতে এক মুহূর্তে সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। যে সব কথা বলা হোল না, যার দুরূহ ভারে জীবন তার দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, স্বীকৃতির অশ্রুজলে তা হয়ত লঘু হতে পারত। কিন্তু মায়ের মুখ থেকে সে কথা শোনবার সৌভাগ্য হল না আমার। এমন কি মা শেষ বিদায় জানিয়েও যেতে পারেনি। আজ স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে শুধু এই কথাটাই মনে করতে পারছি, প্রফেসর এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল—সুসানা, মা তোমায় ডাকছেন, আশীর্বাদ করবেন।

বিছানা থেকে মা তার রক্তহীন ফ্যাকাশে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। নিঃশ্বাস নিতে বেদনা বোধ করছেন তিনি। মৃত্যু-যন্ত্রণাকাতর দুটি চোখ। যেন নির্বানোন্মুখ প্রদীপশিখা। উঃ আর ভাবতে পারছি না। ভাবতে পারছি না।

মনে পড়ে সে কি রাগ আর মমতাভরা কৌতূহল নিয়ে আমি মায়ের মৃত্যুর পরের দিন আর তার সমাধির দিন বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আর কি আতঙ্কে আমার গলা বুঁজে এসেছিল সে কথাও স্পষ্ট মনে পড়ছে আমার। এখানকার জমিদার তিনি। কিন্তু তিনিই ত আমার বাবা। মায়ের চিঠির বাক্সে মাকে লেখা বাবার হাতের অনেক চিঠি আমি পেয়েছিলাম। সেগুলি তাদের সম্বন্ধের সাক্ষী।

এই কদিনে বাবা যেন অনেক বদলে গেছেন। মুখের সে সৌম্য স্নিগ্ধ জ্যোতি নেই। শোকে তাপে তাঁকে কত ফ্যাকাশে দেখব ভেবেছিলাম। হয়ত দেখব গাল দুটি ঝরে গিয়েছে। এই বয়সে এত বড়ো আঘাতে হয়ত বা খুবই মুষড়ে পড়েছেন। কিন্তু ভুল

আমার ভাঙতে দেরী হোল না। দেখলাম কিনা সে পাথরের বুকে চিড ধরেনি, ভাবের জোয়ার ভঁাটায় দোল খায়নি মন।

এক সপ্তাহ পার হোল না। ঠিক আগের মতই তিনি আমাকে আবার তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। তেমনি ভাবলেশহীন নিরাবেগ শুষ্ক কণ্ঠে হুকুম দিলেন আমাকে বই পড়ে শোনাতে। চেয়ে দেখলাম তাঁর ঘরের দেয়ালে টাঙানো মায়ের ছবিখানি তেমনি ঝোলানো রয়েছে, তখনো সরানো হয়নি। কি জানি হয়ত বা সরাতে দেননি তিনি।

বই পড়া শেষ হলে চলে আসছিলুম, এমন সময় আবার আমাকে ফিরে ডেকে পাঠালেন তিনি। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দ্বিতীয়বার তাঁর হাতে চুম্বন করতে দিলেন। বললেন—মাকে হারিয়েছ—ভয় নেই আমি রইলাম। আমার আশ্রয়ে থাকবে তুমি। বলে আর এক হাতে আমার কাঁধে মৃদু ঠেলা দিলেন। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম তাঁর মুখের সেই সনাতন ভঙ্গীটি। ঠোঁটের দুপ্রান্ত শানিত করে দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন—যাও বাড়ি যাও।

কান্না আমার গলায় ঠেলে আসছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল চীৎকার করে বলি—চলে যেতে কেন বলছেন আপনি? আমি ত আপনারই মেয়ে। আপনিই ত বাবা।

কিন্তু সেই মুহূর্তে কথাই বলতে পারলাম না আমি। সব কথা বুকে চেপে নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে এলাম।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে মায়ের কবরের পাশে গিয়ে বসলাম। বসন্ত এসেছে পরিপূর্ণ মহিমায়, অজস্র পত্রপুষ্পের সম্ভার নিয়ে। নতুন কবরের সোঁদা মাটির গন্ধ বড়ো ভাল লাগল। মা আমার কত কাছের ছিলেন, তাকে অত কাছে নিয়েও মন হু হু করতে লাগল।

কবরের পাশটিতে আমি অনেকক্ষণ চুপটি করে বসে রইলাম। তবু মাতৃহারা অসহায় শিশুর মত কাঁদতে পারলাম কই? পোড়া চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও ঝরল না আমার। মনে হোল বেদনার বোধই বুঝি লোপ পেয়েছে মন থেকে। শুধু একটি মাত্র চিন্তা মাথার মধ্যে অবিশ্রান্ত গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল। মাগো ঐ মাটির অন্ধকার থেকে তুমি কি শুনতে পাবে আমার কথা—তিক্ত বিষাক্ত কণ্ঠে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম আমি—শোনো মা, তিনি আমাকেও তার রক্ষাধীনে রাখতে চান। মেয়ে বলে আমায় কোলে তুলে নিতে তার বাধল। আমার আশ্রয় দিতে চান শুধু। কিন্তু কেন? কেন এমন কথা তিনি বললেন মা?

সে আশ্রয় কিসের লোভে দেবেন সে কথা ভাবতেই ঠোঁটের কোণে আমার হাসি বিষিয়ে উঠল। নির্জ্জন মেয়ের মুখে সেই হাসি দেখে মা যে আমার কবরেও শান্তি পেলেন না তা আমি জানি। নিরুপায় হয়েই মাকে আমার অত বড়ো দুঃখ দিতে হলো।

একটা দুর্বার ইচ্ছা আমার মনে মোচড় দিত। ভাবতাম ঐ জমিদারবাবু যাকে আমি বাবা বলে জানি, তার কাছ থেকে একটা কথা আদায় করব। কোন স্বীকৃতি আদায়ের অভিরুচি নেই আমার। শুধু একটিবার আমাদের রক্তের সম্বন্ধের কথা তাঁর মুখ থেকে শুনতে চাই আমি। শুধু একটিবার তিনি বলবেন এই দুরন্ত বাসনায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম আমি। প্রতি মুহূর্তে সেই বাসনাবহ্নি আমাকে দহন করত। তিনি মানুষটি কেমন তা জানতে আমার বাকী ছিল না। আমি যাঁর মেয়ে হবো, তিনি কতো বড়ো, কত মহৎ কত উঁচু হবেন তা আমার কচি মনের স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে উঠেছিল। আজ যাকে বাবা বলে জানলাম তিনি আমার ধ্যানমূর্তির চেয়ে কত

ছোট হয়ে দেখা দিলেন। কিন্তু তিনি যাই হোন, এ পৃথিবীতে তিনি ছাড়া আর আমার কেউ নেই। এ নির্দয় সংসারে আমি যে কত একা, কত অসহায় তা আমার চেয়ে আর বেশি কে জানে? তবু একথা ভাবতে ভালো লাগে যে আমার মা এই মানুষটিকে ভালবাসতেন। তিনি নিশ্চয় এমন কিছু পেয়েছিলেন এই মানুষটির মধ্যে যার জন্যে মা আমার দেহমনের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলেন এর কাছে। এ কথা ভাবতে ভারী ভাল লাগত আমার। এই অনুভূতি আমার হৃদয়কে নিরন্তর মধু সিঞ্চিত করত।

এমনি ভাবে তিনটি বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। যে ছক কাটা এক ঘেঁয়ে জীবনের চাকায় বাঁধা ছিল আমার ভাগ্য, কোথাও তার চুলচেরা বিচ্যুতি ঘটল না, নিয়তির মত উদাসীন নিপুণতায় তিনি আমাদের জীবনের আনন্দ-বেদনাকে গ্রথিত করে রাখলেন।

আমার ভাই ভিক্টর দিন দিন বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে শিশু হোল কিশোর। ভিক্টরের চেয়ে আমি আট বছরের বড়। ওকে মানুষ করে তোলার ভার আমি সানন্দেই মাথা পেতে নিতাম। কিন্তু ওর বাবা বাদ সাধলেন। তিনি চাইতেন না যে আমি ওর সঙ্গে মিশি। ভিক্টরের জন্য একজন নার্স রাখা হোল। তার উপর কড়া হুকুম হোল ও যেন কোন মতেই আমার সঙ্গে মেলা-মেশা করতে না পারে। আর কোলে কাছে না আসতে পারে। ভিক্টরও কেন যেন আমাকে দেখে ভারী লজ্জা করত। কিছুতেই আমার কাছে ঘেঁসতে চাইত না। আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত সে।

এমনি যাচ্ছিল দিন। এরই মধ্যে একদিন আজকের এই প্রফেসর আমার ঘরে এলেন। ঝড়ের মত এসে ঢুকলেন অত্যন্ত দুশ্চিন্তিত, উত্তেজিত ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায়।

আগের দিন সন্ধ্যায় তার সম্বন্ধে নানা অপ্রীতিকর গুজব কানে এসেছিল আমার। চাকরদের মহলে কানাঘুষা চলেছে লোকটা নাকি জমিদারের মোটা রকমের তহবিল তছরূপ করেছে। এমন কি একজন ব্যবসাদারের কাছ থেকে ঘুষও নিয়েছে শোনা গেল।

আমার ঘরে এসে দারুণ অধৈর্যে টেবিল ঠুকে বললেন তিনি—

আমাকে সাহায্য করতে হবে তোমায়। দেরী করলে চলবে না। যাও, এখুনি আমার হয়ে জমিদারবাবুর কাছে তদবির কর।

আপনার হয়ে তদবির করব? কেন? কিসের জন্যে?

তদবির মানে মধ্যস্থতা করতে হবে। দাঁড়িয়ে বলতে হবে আমার হয়ে তোমার বাবুর কাছে। এ বাড়িতে আমি ত আর অপরিচিত আগন্তুক নইরে বাবা। স্বীকার করি আমি দোষী। কিন্তু সে ত কথা নয়—যদি তোমার বাবু আমায় তাড়িয়ে দেন আমায় ত গিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। দুবেলা দু'মুঠো অন্নও না জুটতে পারে। আর আমি পথে দাঁড়ালে তোরও যে পথে ঘর হবে সে কথাটাও ভেবে দেখিস।

কিন্তু আমি তাঁর কাছে কি করে যাব? তাঁকে বিরক্ত করতে পারব না আমি।

ন্যাকা মেয়ে। তাঁকে বিরক্ত করতে পারব না আমি। সে অধিকার যে আছে তোর।

কিসের অধিকার?

ঢের হয়েছে, আর মিথ্যে ন্যাকামি করতে হবে না। অনেক কারণেই তিনি তোকে বিমুখ করতে পারবেন না। কেন করবেন না তা বোঝবার ঢের বয়স হয়েছে তোর। আমার মুখ থেকে সে কথা নাই-বা শুনলি।

মুখে এক কদর্য হাসি ফুটে উঠল তার। বিষ মাখানো দৃষ্টিতে তাকাল সে আমার দিকে। দেখে আমার গাল দুটো যেন আগুনে পুড়ে যেত লাগল। একটা প্রবল ঘৃণা আর বিতৃষ্ণার ঢেউ উঠতে লাগল বুক ছাপিয়ে। সে উত্তাল তরঙ্গে আমি কোথায় ভেসে গেলাম, হারিয়ে গেলাম।

হ্যাঁ, আপনার ইঙ্গিতের মর্ম আমি বুঝতে পারছি—বললাম আমি। নিজের গলা নিজের কানেই কেমন যেন বেসুরো ঠেকল। এই ঘৃণ্য মানুষটার দিকে তাকিয়ে বিশ্রী কটু কণ্ঠে বললাম—তাঁর কাছে আমি যাব না। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত পেতে কিছু চাইতে পারব না। তাতে আমার কপালে অন্ন জুটুক আর নাই জুটুক।

শুনে রাগে কাঁপতে লাগল এই প্রফেসর। দাঁতে দাঁত পিষে ঘুষি পাকিয়ে দাঁড়াল যেন সে। সাপের মত হিস হিস করতে লাগল তার গলার স্বর। যখন কথা কইলে জিভ দিয়ে যেন বিষ ছড়াতে লাগল আমার গায়ে। বললে—

বহুৎ আচ্ছা। একটু সবুর করুন মহারানী। এ অপমান আমি সহজে ভুলব না।

সেই দিনই জমিদার বাড়ি থেকে তলব এসেছিল সেই প্রবঞ্চকের। জমিদারবাবু নাকি বেত উঁচিয়ে শাসিয়েছিলেন ওকে। এসব কথা পরে শুনেছি আমি।

তবে প্রফেসরের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। শেষ পর্যন্ত জমিদার-বাবু ওকে তাড়িয়ে দিলেন না। এমন কি যে চাকরীতে ও বহাল ছিল সেখান থেকেও সরাননি ওকে। কিন্তু এই লোকটা যে সেদিনকার অপমানের কথা ভোলেনি সেটা বুঝতে তখনও আমার দেরী ছিল।

এই ঘটনার পর বাবার জীবনের দ্রুত পট পরিবর্তন হতে লাগল লক্ষ্য করলাম। তাঁর মন যেন একদম ভেঙে গেছে। মনের সে ফুর্তি উৎসাহ কোথায় যেন উবে গেল, তাঁর সেই গোলাপের মত রক্তাভ লাবণ্যময় গাল দুটো ক্রমশ নিষ্প্রভ হলদে হয়ে উঠতে লাগল। এতদিন পরে মুখের চামড়াগুলো জরাস্পর্শে যেন কুঁচকে যেতে শুরু করল। সামনের একটি দাঁত পড়ে গেল। বাড়ি থেকে বেরোনো একদম বন্ধ করে দিলেন তিনি।

মাঝে মাঝে বাবা তাঁর প্রজাদের সঙ্গে দেখাশুনো করতেন। এইসব দিনগুলো ছিল এ বাড়ির উৎসব আনন্দের দিন। প্রজারা বড় হলঘরটায় এসে জমায়েত হোত। তিনি ব্যালকনিতে, কখনো বা তাদের মাঝখানে হলঘরে এসে দাঁড়াতেন। তাঁব কোটেব বাটনহোলে থাকত একটি গোলাপ ফুলের বোকে। রূপোর পাত্রে ঢালা দামী মদে চুমুক দিতে দিতে বক্তৃতা করতেন।

—তোমাদের পরিশ্রমে উৎসাহে আমি ভারী খুশি হয়েছি জানবে। আমার কাজেও নিশ্চয় তোমাদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছি। এই তোমরা সবাই ভাই ভাই, সবাই সমান। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমরা সব আনন্দ কর।

মাথা নত করে তিনি নমস্কার জানাতেন সকলকে। প্রজারাও প্রতিনমস্কার করত। কিন্তু আভুমি লুণ্ঠিত হয়ে নমস্কার করা বিধিতে নিষেধ ছিল তাঁর। বলতেন ওতে মনুষ্যত্বের অপমান করা হয়। কোমর অবধি বেঁকিয়ে তারা জমিদারকে মান দিত। বড়ো মিষ্টি সম্পর্ক ছিল জমিদার প্রজায়। তবু যেখানে যাই হোক আগের মতই জমিদার বাড়িতে প্রজাদের খাওয়ান দাওয়ান, আদর আপ্যায়ন চলতে লাগল। উৎসব পার্বনের কোথাও চিড় ধরল না। কিন্তু প্রজারা

আর তাদের জমিদারের দর্শন পেত না। তিনি আর নামতেন না, দেখাও দিতেন না।

তাঁর বসার ঘরে পড়া যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। শুধু সেই নিষ্প্রভ মানুষটিকে ক্লান্ত মনে হোত আমার। পড়ার মাঝ পথে এক এক সময় তিনি যেন হতাশায় ভেঙে পড়তেন। আফশোষ ফেটে পড়ত তাঁর কণ্ঠে। বলতেন—এতদিনের কল বিগড়ে গেল। সব ভেঙে চুরে তচনচ হয়ে।

বাবার সেই দৃপ্ত চোখের দৃষ্টি যে দিনে দিনে দীপ্তিহীন হয়ে আসচে তা তাঁর মুখের দিকে না তাকিয়েও আমি বলতে পারতাম। বিশাল আয়ত চোখ দুটি ছোট হয়ে থাকত ক্লান্তিতে জরায়। আজকাল অধিকাংশ সময় তিনি ঝিমিয়ে কাটান। ঘুমোন যখন জোরে নিঃশ্বাস নেন। যেন শ্বাসকষ্ট বোধ করেন। শুধু আমি যখন যাই মানুষটি সজাগ হয়ে ওঠেন। আলস্য ঝেড়ে ফেলেন শরীর থেকে। একটু যেন সৌজন্যর আতিশয্যই দেখাতে চেষ্টা করেন।

আমি ঘরে এলে চেয়ারে থেকে উঠে স্বাগতঃ করতেন তিনি। এ তাঁর চিরকালের অভ্যাস। এর ব্যতিক্রম হয়েছে কোনোদিন তা মনেই পড়ে না আমার। কিন্তু আজকাল উঠে দাঁড়াতে তাঁর বেশ কষ্ট হয় বুঝতে পারি। যাবার সময় আমার বাহুমুলের নিচে হাত গলিয়ে তিনি আমাকে নিয়ে দরজা অবধি পৌঁছে দেন। শরীরের কষ্ট মানেন না। যেমন করে এসেছেন, সেই রীতিই চালিয়ে নিয়ে চলেন।

আজকালই দেখছি আমাকে তিনি নাম ধরে না ডেকে মাঝে মাঝে সোনামণি বলে আদর করেন।

মায়ের মৃত্যুর দু'বছর পরে বাবার এক প্রিয় বন্ধু মারা গেলেন। এই বন্ধুটির মৃত্যুই যেন বাবার বুকে শেলবিদ্ধ করল। তিনি ছিলেন

বাবার বিলিয়ার্ড খেলার নিত্যসঙ্গী। তাঁর সমসাময়িক কালের এক-জন চিরবিদায় নিল পৃথিবী থেকে এই চিন্তাটাই যেন তাঁর বুকে বেশি করে বাজতে লাগল। আর দিনে দিনে তাঁর জীবনস্রোতে ভাটির টান লাগতে লাগল এ যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

বাবার শরীরে জরা এসে বাসা বাঁধলেও, মন তার ভাঙতে দেখিনি। সেইটুকু সুলক্ষণ দেখে আমার মন ভরসা পেত। কোনো কিছুতেই হার না মানার প্রকৃতি ছিল তাঁর। সেটুকু বজায় করে যাচ্ছিলেনও। দেখতাম কিনা সবসময় মুখে একটা স্মিত অভিজাত হাসি লেগেই থাকত। এমনিই চলছিল বেশ।

পৃথিবীতে থাকার মেয়াদ যে ফুরিয়ে আসছে তাঁর, মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগে প্রথম তার সঙ্কেত পেলেন তিনি। দুপুরে খাওয়ার ঠিক পরেই হঠাৎ মাথা ঘুরতে লাগল তাঁর। সারা শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল। সে ভাবটুকু সামলে নিলেন বটে কোনোরকমে, কিন্তু সেই প্রথম তিনি ভাবতে বসলেন। বড়ো আরাম কেদারার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে ফেললেন—আর কি! হয়ে ত এল।

যাই হোক সে-যাত্রা কোনো মতে সামলে নিলেন। তারপর গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে একমাত্র উত্তরাধিকারী ভায়ের কাছে একখানি চিঠি লিখলেন। দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে এই ভাইটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আজ কি মনে করে তাকেই কাছে ডাকলেন।

তাঁর অসুখ করেছে শুনে প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ ডাক্তার দেখা করতে এলেন তাঁর সঙ্গে। লোকটি একসময় নামকরা ডাক্তার ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে এই গ্রামের নিভৃত নিরালায় নিজের ছোট

বাড়িটিতে অবসর যাপন করছিলেন। কদাচিৎ এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতেন তিনি। অথচ বাবার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল গভীর। কালেভদ্রে কখনো এ বাড়িতে এলে বাবা তাঁকে সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করতেন। পৃথিবীতে বোধ হয় তিনিই একমাত্র লোক বাবা যাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন।

তিনি এসে বাবাকে পরীক্ষা করলেন। বললেন—এই সময় একবার গীর্জার পাদ্রীকে ডেকে পাঠান। কিন্তু বাবা তাতে রাজী হলেন না। বললেন—তাঁকে আর বিরক্ত করে লাভ কি? আমাদের এমন কিছু নেই জীবনে যা তাঁকে জানিয়ে লাভ হবে। আপনি বরং অন্য প্রসঙ্গ পাড়ুন ডাক্তার।

ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে যাবার পর বাবা তাঁর খাস খানসামা মানে ঐ প্রফেসরকে ডেকে হুকুম দিলেন, এরপর আর বাইরের কাউকে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয় এ বাড়িতে।

অসুস্থ শরীর একটু সামলে উঠতেই জমিদারমশায় আমায় ডেকে পাঠালেন। তাঁকে দেখে সেদিন আমি ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম মনে আছে। চোখের কোলে কে যেন নীলের ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। সমস্ত মুখখানি ঝুলে পড়েছে শিথিল হয়ে। শুধু সেই হাসিটি তখনও লেগে আছে মুখে। চিরদিনের মত সেদিনও হাসি মুখে তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। কথা কইতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু বললেন —এবার তুমি সংসারে একা পড়বে সুসি। চালাক মেয়ে হও— তাহলে কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। সংসারের হাটে লেনদেন করে করে চুল পাকিয়েছি। বুড়ো মানুষের কথাটা তুমি মনে রেখো। আমার ভাইকে তোমার কথা বলে গেলাম। সে তোমায় দেখাশুনা করবে। তোমার জন্যে উইলে আমি কিছু সম্পত্তি

লিখে দিয়েছি। তাইতে সামলেসুমলে চললে তোমার কোনরকমে চলে যাবে। যাই হোক সাবধানে থেকো। চিরকাল ত আমি থাকব না। চিরকাল থাকার কথাও নয় মানুষের। একদিন যেতেত হবেই। এই কথা তোমায় বলে গেলাম। আচ্ছা, সুসি তুমি যাও।

মায়ের মৃত্যুর পর যেদিন আমাকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমার মনে যেমন হয়েছিল আজও তেমনি হল। একবার ভাবলাম বলি—আমি ত আপনার মেয়ে। সেই পরিচয়টাই আমায় বলে যান। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবলাম হৃদয়ের এই আর্ত কান্নার ভাষা হয়ত তিনি বুঝবেন না। হয়ত ভাববেন আমি তাঁর সম্পত্তি, তাঁর ধনদৌলতে দাবী জানাতে চাইছি—আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছি। কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা আমি কি করে বলব? পৃথিবীতে কোনো কিছুর বিনিময়েও ত সে-কথা আমি উচ্চারণ করতে পারব না এই মানুষটির কাছে। এত বড়ো নিষ্ঠুর মমতাহীন পুরুষ, যিনি সব জেনে শুনে একদিনও আমার মায়ের নাম মুখে আনেননি আমার সমুখে, তাকে আমি উপযাচিকা হয়ে কি করে এত বড়ো কথাটা বলব? যার চোখে আমার উনিশ বছরের জীবনের কোনো মূল্য নেই, আমার পিতৃকুলের কোনো পরিচয় জানি কিনা সে-সম্বন্ধে যার এতটুকু কৌতূহল বা মাথা ব্যথা নেই, তার সামনে ভিক্ষার অঞ্জলি পেতে দাঁড়াতে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। হয়ত তিনি ভেবেছেন যে আমি জানি সব কথা। তাই তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। হয়ত বা চান না একটি ডাগর মেয়ের সুখ-সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হতে—তার তরুণী কণ্ঠের সুখ পাঠের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে। নিজের স্ত্রীকে মর্যাদা দেননি। নিজের মেয়েকে মর্যাদা দিলেন না। না দিন। তবু এত বড়ো অপরাধের বোঝা

মাথায় নিয়ে তাকে একদিন ঈশ্বরের দরবারে হাজির হতে হবে। কৈফিয়ৎ দিতে হবে সব কিছুর।

যখন মানুষের শিওরে এসে দাঁড়ায় মৃত্যুদূত তখন ইহলোকের মায়াও তাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরে। তখন মৃত্যুপথযাত্রীর পিপাসিত চোখ প্রিয়জনকে দেখতে চায়। পিপাসিত শ্রবণ শুনতে চায় প্রিয়জনের অমৃতভাষ। কিন্তু তিনি তা শুনতে পাবেন না। বেঁচে থাকতে কোনোদিন তাঁকে বাবা বলে ডাকতে দেননি আমায়! আজ যত কষ্টই হোক মুমূর্ষুর কানে আমি সেই মধুক্ষরা শব্দ পৌঁছে দেব না। মাকে যত কাঁদিয়েছেন তিনি, তার জন্যে ক্ষমা করব না তাঁকে। আমাকে যে-ভাবে সংসারের হাটে অবহেলায় ফেলে দিয়ে যাচ্ছেন অমর্যাদায়, তার জন্যেও তাঁকে ক্ষমা করব না কোনোদিন। করতে পারব না। হয়ত আমার অক্ষম ভালবাসার প্রয়োজনও ছিল না তাঁর। কোনো আসক্তি ছিল না মেয়ের ভালবাসার। কিন্তু কি জানি কেন বারবার আমার মনে হয়েছিল, না সে হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। ক্ষমার প্রয়োজন নেই তাঁর এ কখনো হতে পারে না। তবু ক্ষমা তাঁর ন্যায্য পাওনা নয়—তা তিনি পাবেনও না আমার কাছে। শেষ অবধি পেলেনও না।

একমাত্র ভগবানই বলতে পারেন শেষ পর্যন্ত আমি আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারতাম কিনা। একটি কিশোরীর লুব্ধ মুগ্ধ কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হত কিনা জানি না। আমার লজ্জা গর্ব অভিমানকে শেষ অবধি আমি পরাস্ত করতে পারতাম কিনা, সে পরীক্ষা দেবার সুযোগ আমার হল না। মায়ের মত আমার বাবাকেও মৃত্যু হঠাৎ রাতের অন্ধকারে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আর এক রাতের মত সেবারও প্রফেসরই আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বাবার মৃত্যুসংবাদ দিলেন।

আমরা একসঙ্গে বড় বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলাম। মৃত্যুমুহূর্তের অন্তিম চিহ্নগুলি দেখা ঘটে ওঠেনি আমার ভাগ্যে। মায়ের অন্তিম মুহূর্তের ছবিখানি আজও অক্ষয় হয়ে আছে আমার মানসপটে। কিন্তু বাবার ঘরে ঢুকে প্রথম চোখে পড়ল জরীর ঝালর বসানো বালিসে শোওয়া একটি মনুষ্য মূর্তি। তীক্ষ্ণ তার নাক, ধুসর ভ্রূ। যেন গাঢ় রংয়ের একটি মস্ত পুতুল। গা মুখ তার শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে। দেখাচ্ছে বীভৎস এক প্রেতমূর্তি।

ভয়ে আতঙ্কে আমি কেঁদে উঠেছিলাম মনে আছে। ঘর থেকে পালিয়ে এসেছিলাম দারুন বিতৃষ্ণায়। তারপর আর কিছু মনে ছিল না। কি করে যে সেই প্রাসাদের অলি পথ ঘুরে খোলা হাওয়ায় চলে এসেছিলাম আজ তা আর কিছুই মনে পড়ে না। শুধু সেই আতঙ্কের কথাটাই সুস্পষ্ট মনে গেঁথে আছে আজো। মৃত্যুকে অমন বীভৎসতায় জীবনে কখনো দেখিনি।

পরে শুনেছিলাম প্রচণ্ড শব্দ পেয়ে বাবার খাস খানসামা তাঁর ঘরে ছুটে এসে দেখেছিল বাবা বিছানা থেকে কযেক হাত দুরে মেঝেতে জড়সড় হয়ে বসে আছেন। মৃত্যুর পুর্বে তিনি দুবার শুধু বলেছিলেন —আজকে আমার ছুটি ঠাকুমা। আজ বড়ো মজার ছুটি।

সেই নাকি তাঁর শেষ কথা।

এরপর পুরো পনের দিন আমরা নতুন মনিবের জন্যে আকুল আগ্রহে তাকিয়ে ছিলাম। নতুন মনিবের কাছ থেকে হুকুম এসেছে, যেখানকার যে জিনিস সেইখানেই থাকে যেন। কোনো কিছু কেউ না যেন স্পর্শ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিজে সব কিছু দেখছেন ততক্ষণ যেন কাউকে কাজে জবাব না দেওয়া হয়। তাঁর আদেশ

মত আসবাবপত্র ড্রয়ার টেবিল সব জিনিসে তালা লাগিয়ে শীলমোহর করা হল। চাকর খানসামাদের মুখে মুখে অনিশ্চিত ভয়ের ছায়া। গা ছম ছম ভাব নিয়ে উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় যেন নিরানন্দ দিন গুনছে তারা।

হঠাৎ আমি যেন এ বাড়িতে মস্ত একজন কেউ হয়ে উঠলাম। সবাই আমায় সমীহ করতে লাগল। নতুন দিদি বলেই ডাকত সবাই। কিন্তু এতদিন যেন সেই চেনা কথাটার নতুন তাৎপর্য হতে লাগল। বিশেষ একটা জোর দিয়ে সবাই উচ্চারণ করতে লাগল কথাটা। চাকরদের মহলে কানাঘুষা চলছে—বুড়ো কর্তা হঠাৎ মারা গেলেন। ধর্মযাজক ডাকারও পর্যন্ত সময় হয়নি। বহুদিন ধর্মযাজকের কাছে পাপ স্বীকারের সময় পাননি তিনি। অথচ একটা উইল তৈরী হতে একটুও দেরী হল না।

সেদিনের বড়ো খানসামা এই প্রফেসরের আচার-আচরণও অনেক পাল্‌টে গেল। বন্ধুত্ব বা মধুর স্বভাবের ভান করলে না সে। এটা অবশ্য ভাল করেই জানত যে আমি তার কোনো কথা শুনব না, আমার উপর জোর খাটাতে গেলে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হবে তাকে।

কেমন একটা হারমানা ভাব ফুটে উঠল তার মুখে। যেন ভাবে ভঙ্গিতে বোঝাতে চায়—এই দেখো না আমি সরে দাঁড়িয়েছি।

বাড়ির সবাই আমাকে সম্মান দেখাতে লাগল—কেমন করে আমাকে খুশি করবে সেই যেন একমাত্র চিন্তা হয়ে উঠল তাদের। ওরা যে আমাকে ওদের ব্যবহারে কতখানি আঘাত করছে তা ওরা বুঝতে পারে না কেন? কেন এই আত্মবিড়ম্বনা। এক এক সময় ভারী আশ্চর্য লাগে।

এইসব পাঁচরকমের মধ্যে একদিন আসল মনিব এসে উপস্থিত হলেন।

জমিদারবাবুর চেয়ে নতুন মনিব বছর দশের ছোট। রাজদপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন। বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু একটি মাত্র ছেলে রেখে বৌ কিছুদিন পরেই মারা যান। তারপর আর বিয়ে করেননি তিনি। দু ভায়ের মুখে আশ্চর্য মিল আছে দেখলাম। ছোট ভাই দাদার তুলনায় মাথায় খাটো কিন্তু বেশ দোহারা গড়ন তার। মাথা ভর্তি টাক—দাদার মতই চোখের মণি দুটো উজ্জ্বল কালো, আরো বেশি যেন জ্বলজ্বলে। ঠোঁট দুটি লাল টকটকে। দাদা যেমন ফরাসী ঘেঁসা, ছোট ভায়ের মুখে তেমনি রাশিয়ান যেন খই ফোটে। ছোট ভাই দাদাকে ফরাসী দার্শনিক বলে ঠাট্টা করতেন।

লোকটির মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে। হাসেন যখন চোখ বন্ধ করে থাকেন আর হাসির গমকে সারা শরীর বিশ্রীভাবে দুলতে থাকে। যেন অসহ্য রোষে কাঁপছে সারা শরীর। প্রতিটি জিনিস নিজে দেখেন—অন্যের মুখে ঝাল খাবার অভ্যাস নেই তার। আর কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটির হিসেব না নিয়ে কাউকে রেহাই দেন না কখনো। তার আঁটসাট কাজে এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও।

এসেই প্রথম দিন তিনি শান্তি স্বস্তয়নের ব্যবস্থা করলেন। শান্তির জল প্রতি ঘরে সব কিছুর উপর ছিটিয়ে দিলেন—এমন কি ছাদ কড়ি-কাঠ পর্যন্ত বাদ গেল না। এইভাবে প্রেতাত্মাকে বাড়ির ত্রিসীমানা থেকে তাড়িয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

তারপর বাড়ির চাকরবাকরদের উপর নজর দিলেন। দাদার প্রিয় খানসামাদের অদল-বদল করে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। একজনকে পাঠালেন মহলে, কজনের শাস্তি হল।

জমিদারবাবুর একজন প্রিয় তুর্কী খানসামা ছিল—তার উপর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ-বাড়ির সীমানা ত্যাগ করার আদেশ হল। চাকর-বাকরদের সামনে একটা আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই নাকি এরকমটা করলেন। নতুন মনিবের দাপটে চাকর খানসামারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ল। মৃত মনিবের জন্যে নীরবে অনেক অশ্রু ঝরতে লাগল।

একজন বুড়ো থুরথুরে খানসামা একদিন আমার সামনে ত কেঁদেই ফেলল—জামা-কাপড় ঘর বাড়ি পরিষ্কার তকতকে থাকলেই পুরোনো মনিব খুশি ছিলেন। চেঁচামেচি বরদাস্ত করতেন না তিনি। ব্যাস, ঐ পর্যন্ত। তারপর কে কি করছে তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাতেন না। একটা মাছিকেও কখনো কষ্ট দিতে জানতেন না। এত দয়ার শরীর ছিল তাঁর। আর এখন বড়ো দুঃসময় এল। বেঁচে থেকে আর কি লাভ—এখন মরাই ভাল।

আমার অবস্থারও বদল হতে লাগল। জমিদারবাবুর কাগজপত্তর ঘেঁটে নাকি কোনো উইল পাওয়া গেল না। আমার স্বার্থের অনুকূলে একটি চিরকুটও কোথাও লেখা নেই। এ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি বাড়ির সকলের ব্যবহারে আশ্চর্য বদল দেখলাম। আমার ছায়া কেউ মাড়াতে চায় না—যেন আমাকে এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচে তারা। প্রফেসরের কথা আমি বলছি না। বাড়ির অন্যান্য প্রত্যেকেরই কথায় এমন একটা রাগ প্রকাশ পেতে লাগল যেন আমি তাদের কত ঠকিয়েছি।

একদিন রবিবারের উপাসনার পর নতুন মনিব আমাকে ডেকে পাঠালেন। এতদিন আভাসে ইঙ্গিতে তাকে দেখেছি। আমাকে যেন তিনি দেখেও দেখতে পেতেন না। তার পাঠাগারেই সাক্ষাৎ হল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। পরনে ছিল সরকারী

ইউনিফর্ম। দুকাঁধে দুটো মর্যাদাসূচক তারকা ঝকঝক করছে। আমি যখন দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম বুকের ভিতর দম-বন্ধকরা একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। কিছু যেন ঘটবে, এমনি একটা প্রাকসঙ্কেত পাচ্ছিলাম।

কিন্তু সে কিসেব তা বুঝিনি তখন।

দরজার মূলে গিয়ে দাঁড়াতেই নতুন কর্তা আমার দিকে ফিরলেন। প্রথমে দেখলেন আমার পা দুখানি। তারপর হঠাৎ চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতেই সেই চোখ যেন আমার গালে সপাটে চড় মারলে।

তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম আমি—বললেন তিনি—দেখতে চেয়েছিলাম এইজন্যে যে নিজের মুখে তোমায় একটা কথা জানাব। আমার কাছে থাকলে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো। আমি তোমার সৎপিতাকে সব কথা বুঝিযে দিয়েছি সে মতই সব চলবে এখানে। শুধু জেনে যাও যে তোমায় দেখে আমার ভালই লেগেছে। কাঁচা বয়েস তোমার, রূপও তোমাব কম নয়, সুতরাং বুঝতেই পারছ ত পুরুষমানুষ—বলে হি হি কবে হাসলেন তিনি। সে হাসি শুনে সেদিন নারীত্বের অপমানে যত না ব্যথা পেয়েছিলাম তার চেয়ে বোধ করি বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে। এ সংসারে আমার নিজের বলে আর কেউ নেই। আমি একা—নিতান্তই একা, এই কথাটাই বড়ো নিষ্ঠুরভাবে সেদিন মনে লেগেছিল।

ড্রয়ার খুলে এক গোছা নোট তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন—এগুলো রাখো। তোমার হাত খরচা চলবে। আবার তোমায় আমি শীগগীর ডেকে পাঠাবো। তোমাকে ছেড়ে আমার চলবে না।

হাত পেতে আমি সে টাকা নিলাম। তিনি যা দিতেন তাই আমাকে নিতে হোত। কিন্তু নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বিছনায় বসে সেদিন অনেকক্ষণ ধরে আমি কেঁদেছিলাম। কখন হাতের মুঠো থেকে টাকার গোছাটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না। এই সময় প্রফেসর ঘরে এসে সেগুলো কুড়িয়ে পেলে।

যা ইচ্ছে হবে খরচ করতে, আমায় বোলো,—এই কথা বলে টাকাগুলো নিজের কাছেই রাখলে সে।

এ বাড়িতে সবই পালটে গেল। এই খানসামাটির সঙ্গে কথা-বার্তা কয়ে ভারী ভাল লাগল আমাদের নতুন কর্তার। তাকেই তিনি তখন খাস খানসামা বহাল করলেন। সেই হোল নতুন কর্তার সর্বাধিক প্রিয়। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হয়েছিল, কেননা কর্তা আমাদের ঘোর রাশিয়ান। যা রাশিয়ান নয় তাইতেই ছিল তার ঘোর বিতৃষ্ণা। এই প্রফেসর মানে আমার সৎপিতা দিনে দিনে সব দিব্যি মানিয়ে নিলে। তখন আর কোনো অসুবিধে রইল না।

তখন তার হাসির পালা পড়ল। খুশির পালা। সেই পালা আজও অবধি চলছে। সেই সময় থেকেই মহা রাশিয়ান ভক্ত হয়ে উঠেছে দেখছি।

রবিবারের গীর্জায় উপাসনা হত। নতুন কর্তা সাড়ম্বরে সেই সব উপাসনায় যোগ দিতেন। তারপর মেয়েরা নাচত গাইত। তাদের সঙ্গে গানে যোগ দিতেন তিনি। পা ঠুকে ঠুকে তাল দিতেন। কোনো কোনো সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়ের গাল টিপে দিতেন।

কিন্তু বেশিদিন এখানে রইলেন না তিনি। ফিরে গেলেন পিটার্স-বার্গে। তখন সমস্ত জমিদারীর ভার পড়ল এই লোকটির উপর।

আর সেই সময় থেকেই দুর্যোগের মেঘ ঘনাল আমার আকাশে। শিশুকাল থেকেই গানে আমার ঝোঁক ছিল, সেই দুর্দিনে গানই হোল আমার দোসর। গান নিয়ে আমি দুঃখু ভুলে রইলাম। কিন্তু এই প্রফেসরের অত্যাচার দিনে দিনে আমার অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। একদিন পুরোনো মনিবের কাছে তার হয়ে বলতে আমি নারাজ হয়েছিলাম, সে কথাটা তখনো সে ভোলেনি। সেই কথাটা সে বারংবার মনে করিয়ে দিত আমায়। নতুন কর্তার কাছে লম্বা লম্বা মিথ্যে কথা জানানো চিঠি আমাকে দিয়ে কপি করিয়ে নিত সে। রাজ্যের বানান ভুল তার আমায় সংশোধন করে দিত হোত। রাশি রাশি ভুল হিসেব বানাতে হোত।

তোমার মত মেয়েকে কি করে পোষ মানাতে হয় তা আমি জানি—মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ভয় দেখাত সে আমায়—অমন করে কি দেখছ আমার দিকে। ও সব ভয় দেখানো বড়ো গেরাহ্য করি কিনা আমি।

এত অত্যাচাব আমার সহ্য হোত না। এক এক সময় মন এমন বিষিয়ে উঠত যে বলে বোঝাতে পারব না। কি একটা আসন্ন বিপদের ভয়ে সর্বদাই মন আমার সশঙ্কিত হয়ে থাকত। রাত্রে ঘরে আলো জ্বলত না। সেই অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে আমি তিমির মন্থন করতাম। ভেবে ভেবে রাত কেটে যেত। এক ফোঁটা ঘুম আসত না পোড়া চোখে। আর সেই জগৎজোড়া অন্ধকারেব মধ্যে শুয়ে আমার মন এক অসম্ভব সংকল্পে দৃঢ় হয়ে উঠত।

এই সময় হঠাৎ নতুন কর্তা আবার ফিরে এলেন। শুনলামা এতকাল চাকরী করার পর মস্ত কিছু একটা খেতাব পাবার প্রত্যাশ তার সফল না হওয়ায় বিরক্ত হয়ে তিনি চাকরী ছেড়ে চলে

এসেছেন। এবার থেকে নিজের জমিদারীতেই থাকবার মতলব তার। এইখানেই জীবনের বাকি দিন কাটাবেন স্থির করেছেন।

এলেন একাই। ছেলে এল নতুন বছরের ছুটি বরাবর।

এই প্রফেসরের তখন কাজ পড়ল বিস্তর। সারাদিনই তার কাটত কর্তার ঘরে। তিনি শুনলাম এখানে একটা কাগজ কল তৈরী করবেন ঠিক করেছেন। প্রফেসরের সাহায্য দরকার। দুই মানুষের তখন আর নাইবার খাবার অবসর রইল না। আমি অনেকখানি স্বস্তিতে রইলাম কিছুদিন।

এত বড়ো জমিদারীর কাজকর্ম, নতুন কারখানা তৈরী করা, তার ব্যবস্থা করা, নতুন অফিস কাছারির তদ্বির তদারক করা, এই নিয়ে দিনরাত মেতে ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যেও আমায় যে তার দরকার হতে পারে তা ভাবতে পারিনি আমি। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাবেলা তার ঘর থেকে আমার ডাক এল।

তার বসার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই আমার ওপর হুকুম হল পিয়ানো বাজানোর। মন দিয়েই বাজালাম। দেখলাম দাদার মতই এ লোকটারও গান বাজনায় ভাল লাগালাগির কোনো বালাই নেই। তবু ভদ্রতা করে তিনি আমায় প্রশংসা করলেন। পরের দিন তার সঙ্গে খাওয়ার নিমন্ত্রণ হোল আমার।

খাওয়া হয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে তিনি গল্প করলেন আমার সঙ্গে। অনেক কথা। হাসলেন খুব। কথা শুনতে শুনতে তার সেই চোখের অবাক চাউনি সেদিন আমার একটুও ভাল লাগেনি। অস্বস্তিতে সমস্ত শরীরটা রি-রি করছিল যেন। আর এমন বেহায়ার মত কেউ কখনো মেয়েদের দিকে চায়? যেন সর্বস্ব দেখে নিতে চাইছেন আমার বড়ো। বড়ো চোখের আলো পড়েছে

আমার গায়ে, কিন্তু আমি ত দেখছি সেই আলোর আড়ালে কি এক কুশ্রী অন্ধকার থমথম করছে তার মনে।

—আমায় কিছু পড়ে শোনাবার দরকার হবে না। চোখ দুটো এখনো বেশ কাজ করছে আমার নিজেরই। কিন্তু বিকেলবেলা আমার এখানে আসবে তুমি রোজ—বললেন তিনি—তোমার মিষ্টি হাতে বিকেলের কফির স্বাদ মুখে লাগবে অন্যরকম। আমি কফি খাবো, তুমি পিয়ানো বাজাবে। কেমন ?

সেই দিন থেকে বিকেল আমার বড় বাড়িতে বন্দী হল। বিকেলে যেতাম, আসতে কোনো কোনো দিন সন্ধ্যে উতরে যেত।

নতুন কর্তা আমায় ভালবাসতেন, কিন্তু সে ভালবাসায় আমার আনন্দ ছিল না। ঐ মানুষটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কি বসলে আমার কেমন যেন ভয় ভয় হোত। সে কেমন তার কথায় কখনো প্রকাশ পেতো না, স্পষ্ট হোত তার চোখের চাউনিতে, তার নোংরা হাসিতে। আমার বাবা, যিনি তার দাদা, তাঁর কথা কখনো তিনি বলতেন না। ইচ্ছে করেই মনে হয় সে-সব প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতেন, কেননা তার মনের অভিপ্রায়ের পথে সে চিন্তা বোধ হয় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠত। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই লজ্জায় আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠত।

বড় দিনের ছুটির শেষে কর্তার ছেলে মিচেল এল।

এর পর আর লেখা কি যে কষ্টকর সে আমি কাকে বলে বোঝাব। এতদিন ছিল আমার দুঃখের দিন। কিন্তু এবার এলো আমার হাসিকান্নার দিনরাত্রি। আমার প্রথমযৌবনের আবেগ-থরথর মুহূর্তগুলির বর্ণালী। মিচলকে আমি ভালবেসেছিলাম। সেও আমায় ভালবাসত।

বাইরে তুষারপাত হচ্ছে। ঝড় উঠেছে সন্ধ্যের মুখে। ড্রয়িং রুমের পিয়ানোয় বসে আমি ওয়েবারের সোনাটা বাজাচ্ছি। এমন সময় একটি তরুণ যুবক ঘরের ভিতর এসে ঢুকল। কি সুন্দর দেখাতে লাগল তাকে। কি একহারা সুপুরুষ চেহারা। সর্বাঙ্গে কণা কণা তুষার লেগে ছিল। ঘরের ভিতর এসে সেগুলো ঝেড়ে ফেলে দিলে সে। তার পর বাবার দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ তার দৃষ্টি বন্দী হোল পিয়ানোর সামনে বসা একটি তরুণীর চোখে। মুহূর্তে সেই তরুণ মুখখানিতে কি মাধুরী ফুটে উঠল, জাগল কি পরমাশ্চর্য অবাক সৌন্দর্য তা জীবনে আমি ভুলব না কোনদিন। সেই মুগ্ধপুরুষ একযুগ মুগ্ধনেত্রে আমায় দেখলে। আমি দেখলাম তাকে। তারপর তার সম্বিত ফিরল। পিতৃসমীপে গিয়ে দাঁড়াল সে। কথা কইলে যখন, আমার কানে অমৃত বর্ষিত হোল। কোমল তার গলার স্বর। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে মনের এক স্নিগ্ধ মাধুর্য ঝরতে লাগল।

ছেলেকে পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হলেন বাপ। বললেন, দিন পনেরোর মাত্র ছুটি ?

ঐটুকু অবধি শুনলাম। তারপরই আমার ছুটি হোল সেদিনের মত।

নিজের ঘরের জানালায় বসে রইলাম কত রাত অবধি। বড় বাড়িতে ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। কাঁপছে তাদের আলো ঝড়ের হাওয়ায়। আমার মন সেই সব আলোর শিখার মত কাঁপতে লাগল থরথর করে।

সারা বাড়িতে আজ উৎসবের কলরব উঠেছে। অনেক চেনা গলার মধ্যে মাঝে মাঝে কানে আসছে একটি অচেনা মধুর গলা।

এই নিরানন্দ পুরীতে কোথা থেকে এল এই আনন্দের দূত, ভাবলাম আমি। যে মানুষ আমার মনের অন্তঃপুরেও উল্লাসের শিহরণ জাগালে।

পরের দিন খাবার আগে তার সঙ্গে আমার দেখা হোল। কথাও হোল প্রথম। আমাদের বাড়িতেই এসেছিল সে এই প্রফেসরকে কি খবর দিতে। বসেছিল আমাদেরই ছোট বসার ঘরে। দু'একটা কথার পর আমি উঠে যাচ্ছিলাম, সেই আমায় বসালে। কি ভাল লাগল তার সঙ্গে কথা কইতে। শহরে থাকে। মনে মনে ভয় ছিল হয়ত বা শহুরে ছেলেদের মত দাম্ভিক হবে, হবে সবজান্তা। আমার মত পাড়াগেঁয়ে মেয়ের ভীরুতাকে সহজেই জয় করলে নিচেল।

কত লোক দেখেছি, মুখ হাসলেও যাদের চোখ হাসে না। এই দুটি চোখ যেন সর্বদাই খুশিতে হাসছে। আর তার ঠোঁটের দুপ্রান্তে দুটি স্নিগ্ধ বঙ্কিম রেখা ওর মুখখানিকে কি যে অপরূপ সুন্দর করেছে তা বোধ করি ও নিজেই জানে না। একটি ঘণ্টা ধরে আমরা গল্প করলাম। তার মুখ থেকে একটি মুহূর্ত আমি চোখ সরাতে পারিনি। কি কথা হয়েছিল সব মনেও নেই, কিন্তু সেই একমুঠো সময় আমার বড়ো আনন্দে কেটেছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি পিয়ানো বাজাতে বসলাম। নিচু আরাম কেদারায় বাহুতে মাথা দিয়ে শুয়েছিল নিচেল। মাথায় তার একরাশ কোঁকড়ান চুল। চোখ বুজে নিঃশব্দে শুনছিল সে বাজনা। গান বাজনায় তার খুব সখ সে-কথা সকাল বেলাই বলেছিল আমায় নিচেল। মুখে আমার প্রশংসা না করলেও তার মুখ দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে বাজনা তার ভালই লাগছে। তাকে খুশি করার আনন্দে আমি প্রাণের আনন্দে বাজাচ্ছিলাম। কর্তা ছেলের কাছেই বসে ছিলেন। হঠাৎ কি হোল, তিনি সোজা হয়ে বসলেন। আমার

বোতামগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন—যথেষ্ট হয়েছে বাজনা। জলে ভেজা পাখী যেমন ডাকে তেমনি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কি যে বাজাচ্ছে, শুনে মাথা ধরে গেল। আমরা বুড়ো হাবড়া আমাদের জন্যে অত দরদ দিয়ে বাজিয়ে দরকার নেই তোমার। তুমি আজ যাও।

লজ্জায় অপমানে আমি চলে আসছিলাম, নিচেল আমার সঙ্গে আসতে লাগল।

তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমার আবার হোল কি? ছেলেকে উদ্দেশ করে বললেন তিনি। তারপর প্রফেসরকেও কি যেন বললেন নিচু কণ্ঠে, তা আর আমি শুনতে পাইনি। কিন্তু প্রফেসরের বিষাক্ত হাসি আমার কানে এল।

পরের দিনও সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল।

দিন চারেক পরে একদিন করিডরে আমার নিচেলের সঙ্গে দেখা হোল। সে আমার হাত ধরে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেল। এ ঘরখানিতে এই জমিদারবংশের পূর্বপুরুষদের ছবি টাঙান থাকে।

নিচেলের হাত ধরে যখন সেই নিরালা ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম, আমার অল্প বয়সের যৌবন যে সে মুহূর্তে শিহরিত হয়নি তা বলব না, কিন্তু কোনো ভয় হয়নি আমার। পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই আমি নিচেলের সঙ্গী হয়েছিলাম। বোধ করি সেই মুহূর্তে তার পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও চলে যেতে পারতাম আমি। তার কাছ থেকে আমার কোনো ভয়ের কারণ ছিল না।

এ সংসারে আমি ত একা। আমার কেউ নেই স্নেহ করার, দয়া করার, আশ্রয় দেবার। সংসারের শত্রুব্যূহের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম যুবতী মেয়ে আমি। দেবতার আশীর্বাদের মত এসেছিল নিচেল

আমার জীবনে। তাকে ভালবেসে জীবন আমার আশ্রয় পেয়েছিল। সারা মন দিয়ে আমি তাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। তাকে ছাড়লে আমার যে আর কিছু থাকত না সেদিন।

আমার দিকে তাকাতে পারেনি মিচেল। ধরা গলায় সে আমায় আশ্বাস দিয়েছিল। সংসারে আমি যে কত অসহায়, তা এক দিনেই সে বুঝেছে। তার বাবা আমাকে কষ্ট দিয়েছেন তার জন্যে অনেক দুঃখু করলে মিচেল।

আমার একখানি হাত তার উষ্ণ করতলে ধরে নিবিড় মমতায় বললে মিচেল—আমায় তুমি বিশ্বাস কোরো সুসি। সংসারে যেখানে যত অবহেলাই পাও, একথা তুমি জেনো যে তোমার একটি ভাই আছে। হ্যাঁ সুসি, তুমি আমাব বোনের মত আপনার।

সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল আমাব। লজ্জায় আর আমি মুখ তুলতে পারলাম না। একথা শুনব বলে তৈবী হয়ে আসিনি। আমার বেদনার্ত নারীত্ব যে পবিত্র সুন্দর দৈববাণীটির প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়েছিল দিনরাত্রি, এই আশ্চর্য লগ্নে সে কি এই? তবু তাকে ধন্যবাদ দিলাম আমি।

না, না, কিছু দরকার নেই—বললে মিচেল—আমি তোমার ভাই। এ আমার দায় দায়িত্ব সবই। কোনদিন কোনো কারণে যদি মনে করো বিপদে পড়েছ, আমায় তুমি জানিও নিশ্চিন্ত মনে। আমি তোমার কাছে ছুটে আসব বোন।

আর একবার আমার হাতে চাপ দিয়ে মিচেল বিদায় নিয়ে গেল।

এই একটি দিনের মধ্যে তার সঙ্গে জমিয়ে নেবার চেষ্টা করতে কসুর করেনি প্রফেসর। কিন্তু দুরভিসন্ধি তার সফল হয়নি এই

সোজা মানুষটির কাছে। তাই আরো সর্বনাশের চেষ্টায় মেতে উঠল প্রফেসর। কর্তাকে গিয়ে লাগালে তার ছেলের নামে। বললে, বড়ো দুঃখের কথা যে আপনার অবর্তমানে ঐ ছেলে যে কি করে জমিদারী রাখবে তাই ভাবি। এত হাল্কা মনোভাব, যার তার সঙ্গে কথায় আত্মীয়তা করছে।

কর্তার মনের অলিগলি চিনে নিয়েছিল প্রফেসর, তাই এই বড়ো সাহসের কাজটা করতে তার বাধল না। কর্তাও তাকে বিশ্বাস করলেন। এত বড়ো জমিদারী, কল কারখানা এ-ছেলের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে, এই ভাবনায় তার মন বিচলিত হোল। বয়স হলে মানুষের অমনিই হয় বুঝি। যে তাকে ভেজাতে পারে খোসামোদ করে, খুব ভক্তির ভাব দেখাতে পারে, তাকেই সে প্রাণের চেয়ে মনে করে প্রিয়তর।

বলে তুমি ভালোই করেছ। সাবধান হয়ে চলতে হবে আমাকে।

বিনীত হাস্যে যেন লুটিয়ে পড়ল প্রফেসর—কর্তার যাতে মঙ্গল হয়—

রক্তের ভেতর আগুন জ্বলছে আমার। লিখতে লিখতে হাত কাঁপছে। ভাবছি কি হবে আর সে সব কথা লিখে। কিন্তু তাকে যে আমার সব কথা জানাতে হবে। তা নইলে যে আমার শান্তি নেই।

এইসময় প্রফেসরও আমাকে খুব সুদৃষ্টিতে দেখত। তার মেয়ে হয়ে আমিও যে নতুন কর্তার মন পেয়েছি এ যেন তারই জিত। বাপে মেয়েতে আমরা যেন বিশ্ববিজয় করছি এই রকম ভাব তার। একদিন আমায় আদর করে বললে—আমার খুব ভাল লাগছে তোকে। যে বয়সের যা বুঝলি না। অত রূপ তোর, ঐ সব ঝুটো নীতিজ্ঞান নিয়ে

বসে থেকে নিজের আখের কেউ কখনো নষ্ট করে। আমাদের হোল কাজ গুছিয়ে নেওয়া। ও সব নীতি টিতি গরীবের জন্যে নয়—ও সব বড়লোকদের শোভা।

কিন্তু আমি নতুন কর্তার বিষদৃষ্টিতে পড়ার পর, প্রফেসরের ওপর মিচেল যখন তার রাগ আর গোপন করে রাখলে না, প্রকাশ্যেই সে আমার হয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলে, তখনই আমার দুর্ভাগ্যের শুরু হোল আবার। নির্যাতন বাড়ল ঘরে বাইরে। দিন রাত আমার পিছন পিছন লেগে রইল এই প্রফেসর। যেন আমি কোথাকার দাগী আসামী। যখন-তখন একটা খুন জখম করে ফেলতে পারি।

আমার ঘরের বন্ধ দরজায় একটা সাড়া দিয়ে ঢোকার ভদ্রতার বালাই অবধি রাখত না প্রফেসর। কাদা মাখা বুট পরে একদিন হঠাৎ এসে প্রফেসর যেন আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়লেন—কি ভেবেছ তুমি সুসি ? এ বাড়িতে থেকে তোমার অত দেমাক চলবে না আমি বলে দিলাম। আমার ওপরও তুমি চালাকি করতে চাও। তোমার বিষদাঁত আমি ভাঙব।

পরের দিন সকালেই আমার কাছে খবর পাঠালে প্রফেসর যে আজ থেকে বিকেলে আর বড় বাড়ি যাওয়ার আমার দরকার নেই। দরকার পড়লে কর্তা নিজেই ডেকে পাঠাবেন।

আর এই সময়েই আমার ভাগ্যের চাকা এক চরম নিয়তির দিকে আমায় টেনে নিয়ে গেল। মিচেলের ঘোড়ার সখ ছিল প্রবল। একদিন একটা বড় ঘোড়াকে চালু করতে গিয়ে সে হঠাৎ এমনভাবে লাফিয়ে ওঠে যে মিচেল পাশের ঝোপে ছিটকে গিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় একটা হাত ভেঙে গেল মিচেলের, সেই সঙ্গে বুকেও কিছু আঘাত

লাগল তার। অজ্ঞান অবস্থায় সকলে মিলে ধরে তাকে বাড়িতে নিয়ে এল।

ছেলের ঐ অবস্থা দেখে কর্তা ভয় পেয়ে গেলেন। শহর থেকে বড়ো ডাক্তার এল। তারা যথাসাধ্য করলেন। একটি মাস বিছনায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে গেলেন তারা রোগীকে।

তাস খেলতে জানে না মিচেল। এক হাত ধরে বই পড়া অসম্ভব। তাই শেষ অবধি আমারই ডাক পড়ল বড় বাড়িতে।

সে-সব আনন্দ আমার জীবনকে অনেক সুধায় ভরে দিয়ে গেছে। যাওয়ার পরেই আমি গিয়ে বসতাম তার ঘরে। বসতাম পর্দাটানা একটা জানালার ধারে গোল টেবিলের কাছে। মিচেল শুয়ে থাকত ঘরের আর এক প্রান্তে। আমি ঘরে ঢুকলেই প্রসন্নমুখে সে তাকাত আমার দিকে।

পাণ্ডুর মুখখানি এক ঝলক হাসিতে যেন আলো হয়ে উঠত। বড় বড় কোঁকড়ান চুল পিছনে ঠেলে দিয়ে নরম গলায় আমায় স্বাগত করত।

তখন স্যার ওয়াল্টার স্কটের খুব সুনাম প্রতিপত্তি। তাঁর লেখা আইভান হো পড়তাম আমি। রেবেকার সংলাপ পড়তে পড়তে গলা আমার আবেগে থরথর করে কাঁপত। রেবেকা ত আমিই। তার ভাগ্য ত আমার সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা। তার মত আমিও এক রুগ্ন মানুষকে সেবা দিয়ে সারিয়ে তুলছি। রেবেকার কান্নার সঙ্গে আমার কান্না মিশে একাকার হয়ে যেত।

পড়া থেকে চোখ তুলে যতবার তাকাতাম আমার শ্রোতার দিকে, সেই উজ্জ্বল মুখের নরম হাসি আমায় আদর করত। কথা কইতে পারতাম না ভয়ে। ড্রয়িং রুমের বাইরে সর্বদাই কেউ না কেউ থাকত।

কখনও হয়ত পাহারা নেই। বাইরে সব নিঃঝুম। বই থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছি আমার মিচেলের দিকে। সেও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মুগ্ধ লজ্জায় মরছি মনে মনে, কিন্তু কিছুতেই চোখ নামিয়ে নিতে পারছি না যেন। সেই মৌন মুহূর্তে কত কথা কইছি। যে কথার বাণী নেই, ভঙ্গি দিয়ে কোন জানাজানি নেই। প্রাণ থেকে প্রাণে চলেছে এক মৌন তরণী। চোখে চোখে জ্বলছে আরতির দীপালী।

একদিন সে আমায় বললে—তুমি দাবা খেলতে পার ?

একটু একটু পারি।

তাহলেই হবে। কাউকে বলো না একটা দাবার ছক আর ঘুঁটি আনতে। টেবিলটা আমার কাছে সরিয়ে নিয়ো এসোনা লক্ষ্মীটি।

তার কাছে বসে লজ্জায় আমি যেন আর চোখ তুলতে পারলাম না। অথচ জানলার কাছে বসে আমার অত লজ্জা করত না।

ছক সাজাতে বসলাম আমি। দেখে চাপা হেসে বললে মিচেল —দাবা খেলাটা মিথ্যে। তোমায় কাছে পাওয়াটাই সত্যি।

সাড়া দিলাম না আমি। নিঃশব্দে একটা বোড়ের চাল চ'ললাম। কিন্তু মিচেল খেলছে না দেখে তার দিকে তাকাতেই সে করুণ মিনতি ভরে আমার হাতখানি আরো কাছে চাইলে।

তার কথা বুঝেছিলাম কিনা আজ মনে নেই। কিন্তু মন্ত্রী তার দিকে ঠেলে দিতেই মিচেল দাবার ছকের উপর ঝুঁকে পড়ল। আমার আঙুলে তার ঠোঁট লেগে গেল। সেই মুখ আর তুললে না মিচেল। আমিও সরিয়ে নিতে পারলাম না হাত। এক হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলাম। আমার সেই সুখের কান্নায় দাবার ছকখানি ভিজে সপসপে হয়ে উঠল। আর সেই আমি জানলাম কে আমার হাতখানি

আদর করছে। জানলাম যে এতদিনে আমার জীবনে প্রথম প্রেম এল।

কাঁদছ কেন সুসি?—মিষ্টি করে বললে মিচেল—কেঁদোনা লক্ষ্মী। আমার জন্যে কোনোদিন তোমায় কাঁদতে হবে না।

কিন্তু সেদিন আমায় মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়েছিল মিচেল। আরো অনেক কান্না সে কাঁদিয়েছিল আমায়। কিন্তু সে কান্নায় আনন্দ ছিল না।

কিন্তু আজ আব সে সব কথায় লাভ কি?

সেদিন আমায় কথা দিয়েছিল মিচেল। তার বাবা যে আমাদের বিয়েতে মত দেবেন না, সে কথা লুকোলে না সে আমার কাছে। সে কথা আমিও ভাল কবে জানতাম। কিন্তু মিচেল যে আমাকে মিথ্যে প্রবোধ দেয়নি, সে কথা ভেবে আমার সুখের অন্ত রইল না। মিথ্যেব বেসাতি কোনোদিন করতে পারে না আমার মিচেল।

আমার নিজের সুখের জন্যে আমি কিছু চাইনি। সে আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাব আমি সানন্দে। যেমন রাখতে চায়, তেমনি থাকব।

তুমি হবে আমাব বৌ—বললে মিচেল—আমি আইভান হো নই। লেডি রোয়েনাকে নিয়ে আমি ঘর বাঁধব না। আমি তোমায় চাই সুখের ঘরে।

শীগগিরই সুস্থ হয়ে উঠল মিচেল। তখন আমার যাওয়ার আনন্দ বন্ধ হোল। কিন্তু তাতে দুঃখ নেই। সে আমায় কথা দিয়েছে, সেই কথাই আমার মন ভরে রাখলে। অনাগত দিন কি সুখের সাজি সাজিয়ে বসে আছে আমাদের জন্যে সেই হোল আমার দিবারাত্রির স্বপ্ন। অতীত বর্তমান আমার সব একাকার হয়ে গেল। এই

কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার পেরিয়ে চলেছে আমার জীবন তরণী এক সোনালী উদয় ঊষার দিকে। রাত্রির অন্ধকারে সেই আমার সূর্যতপস্যা।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ আমার কপালে লেখেননি ভগবান।

ভালবাসার ফুলে কাঁটার যন্ত্রণা।

যতদিন মিচেলের কাছে গিয়ে বসেছি দিনরাত পাহারায় পাহারায় কাঁটা হয়ে থাকতাম। কিন্তু তার পরও আমাদের গতিবিধির উপর নজর ছিল ছোটকর্তার। প্রফেসরের বিষাক্ত দৃষ্টি অনেকবার দেখেছি আমি। শুনেছি তার চাপা হাসির আওয়াজ। কিন্তু সে সব তখন আমার মনের সীমানায় কোন অশান্তির ঝড় তুলতে পারত না। তখনকার দিনরাত্রি আমার ভালবাসার অকূল যাত্রা।

আমাদের মধ্যে গোপনে ঠিক হয়েছিল, যেদিন মিচেল শহরে ফিরে যাবে, ও অর্ধেক পথ থেকে ফিরে এসে আমায় তুলে নিয়ে যাবে সঙ্গে। তার ফলে কোন লোক জানাজানি হবার ভয় থাকবে না। সেই সব ব্যবস্থা পাকা করবার ইচ্ছেতেই যাবার আগের দিন বিলিয়ার্ড ঘরে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা জানিয়েছিল মিচেল। তারই এক বিশ্বস্ত চাকরের হাতে সেই মর্মে একখানা চিঠি পেলাম। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমি যেন যাই সেই ঘরে, কেন না আমার সঙ্গে শেষবারের মত সব কথাবার্তা না কয়ে সে আয়োজন পাকা করতে পাচ্ছে না।

এর আগেও তুবার আমি তার সঙ্গে গোপনে দেখা করেছি। ঘরের বাইরের দিকের একটা চাবি ছিল আমার কাছে। সাডে নটার দিকে ঘড়ির কাঁটা ঝুলতেই আমি গায়ে একখানা গরম চাদর জড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পায়ের নিচে হালকা বরফের টুকরো ভাঙছে, মুচ মুচ করে আওয়াজ হচ্ছে। আমি দ্রুত পায়ে যাচ্ছি অভিসারে।

মুখ তুলতেই চোখে পড়ল ছাতের আলসের ঠিক ওপরেই নীলাভ জ্যোতির মণ্ডল রচনা করে সভা জঁাকিয়ে বসেছেন চন্দ্রমা। দেওয়ালের পাশ দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শিষ দিয়ে ফিরছে হিমানী বায়ু। সারা শরীর দিয়ে একটা অনুভূতি দ্রুত ওঠা নামা করছে।

সতর্ক হাতে দরজার চাবী লাগিয়ে নিঃশব্দে অন্ধকার ঘরের ভিতর গিয়ে পড়লাম। পিছনে দরজাটা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়ালাম। মুখ তুলে তাকাতেই চোখে পড়ল দেওয়ালের ধারে একটি ছায়ামূর্তি।

সেই মূর্তি আমার দিকে দু পা এগিয়ে আসতেই আবেগে আমার গলা জড়িয়ে এল। কাঁপা গলায় ডাকলাম, মিচেল।

মিচেল অন্য ঘরে আটক আছে আমার হুকুমে। কার সঙ্গে কথা কইছ বুঝতে পেরেছ।

সেই কণ্ঠস্বরে যেন আমার বুকখানা চিরে গেল ফালা ফালা হয়ে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আমি ছুটে পালাতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ছোটকর্তা আমাকে সবল হাতে ধরে ফেললেন।

যাচ্ছ কোথায় ছিনাল মেয়েমানুষ? গোপনে গোপনে অভিসার করতে শিখেছ। কাঁচা বয়সের ছোকরাদের ভুলিয়ে মজা লুটছ, সেই মজা আমি তোমাকেও শেখাব।

আতঙ্কে শরীর আমার থরথর করে কাঁপছিল। তবু তার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা আমি করলাম। কিন্তু তার বজ্রমুষ্টি আমি বিন্দুমাত্র শিথিল করতে পারলাম না।

ছোট কর্তা আমাকে কঠিন করে ধরে রইলেন।

আমাকে ছেড়ে দিন। যেতে দিন আমায়—মিনতি করে বললাম আমি।

এক পা নড়বে না, আমি বলে দিচ্ছি।

হাত ধরে আমায় জোর করে বসালেন ছোটকর্তা। সেই অন্ধকারে তার মুখখানা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। তার মুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলাম আমি। কিন্তু সেই অন্ধকারে তার ভারী নিঃশ্বাসের আওয়াজ আমার কানে যাচ্ছিল। আর শুনতে পাচ্ছিলাম তার দাঁতে দাঁত পেষার শব্দ।

তখন আমার ভয় কেটে গেছে। ধরা পড়ার নিরাশ ভাবটাও কেটে গেছে মন থেকে। শুধু একটা নিথর বিমূঢ়তা আমার দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে রইল। বাজপাখার নখরাঘাতে অবসন্ন অসহায় ছোট পাখার মত বিবশ দেহে আমি বসে রইলাম। তার সেই হিংস্র আক্রোশের চাপে শরীর আমার কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল।

এতদূর অবধি গড়িয়েছে দেখছি। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে।

তার বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু ছোটকর্তা আমাকে এমন জোরে নাড়া দিয়ে দিলেন যে সর্বাঙ্গ আমার ব্যথায় থরথরিয়ে উঠল। তার মুখের অপমানকর ভাষায় অতিষ্ঠ হয়ে চেঁচিয়ে বললাম—

মিচেল, তুমি আমায় রক্ষা কর। এ অপমান আমাব সহ্য হয় না।

রাগে সব শক্তি দিয়ে ছোট কর্তা আমায় এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে যন্ত্রণায় আমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলাম।

আমার কান্না তার কানে যেতেই ছোট কর্তা আমায় ছেড়ে দিলেন। অন্ধকারে বিরাট ছায়ামূর্তির মত দরজা আড়াল করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ সময় কাটল। নিথর নিস্পন্দ হয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। ছোটকর্তা দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

বোসো চুপ করে—শেষ অবধি বললেন তিনি—চুপটি করে বসে আমার কথার জবাব দাও। আমি দেখতে চাই তুমি উচ্ছন্নে গেছ, না এখনও বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পায়নি। ভুল ভ্রান্তি আমি মাপ করবো, কিন্তু সত্যি যদি দেখি যে গোল্লার পথে পা বাড়িয়েছ—আমার ছেলে মিচেল তোমায় বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে? জবাব দাও—কথা দিয়েছে তোমায়?

সে কথার কোন জবাব দিলাম না আমি!

আমার সাড়া না পেয়ে রাগে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি।

চুপ করে আছ। তাব মানে তোমার কিছু বলবার নেই, এই ত? তুমি হবে আমার পুত্রবধূ। তোমার মত মেয়ে—ফন্দিটা মন্দ করোনি দেখছি। তবে একটা বড়ো ভুল করেছ তুমি। ঐ সব ছোকরারা কাজ গোছাবার জন্যে অনেক, অনেক রকম মন ভোলাবার কথা কয়। বলে রানী করব, সোহাগী হবে। কিন্তু কাজ গুছিয়ে নিয়ে সে সব কথা তারা রাখে না, সে বোঝবার বয়স তোমার হয়েছে। তুমি ত আর চার বছরের কচি খুকীটি নও। তুমি কি ভাব আমার মত ভদ্রলোক তোমার মত একটা মেয়েকে ঘরে স্থান দেবে। ভেবে-ছিলে গোপনে পালিয়ে যাবে, তারপর বিয়ে করে ফিরে আসবে এই ঘরে। বুড়োটার পায়ে পড়ে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে আমার মন ভোলাবে। তখন আর আমার উপায় থাকবে না কিছু। নোংরা মেয়েমানুষ, এই ত চেয়েছিলে তুমি? এই ফন্দিই ত এঁটেছিলে মনে মনে।

কথা বলানোর জন্যে লোকটা হয়ত আমায় খুন করতেও নারাজ ছিলেন না। কিন্তু আমার মুখ থেকে একটা কথাও বার করতে পারেন নি তিনি।

ক'বার এদিক ওদিক নড়ে বেড়ালেন ছোটকর্তা। তারপর অনেকখানি সামলে বললেন—

বুঝতে পারছি যে তুমি ভয় পেয়েছ? ভয় পাওয়ার কথাই। ভাবছ বোধ হয় যে একটা দৈত্য দানবের কবলে পড়ে গেছ। কিন্তু ভয় নেই। আমি ঠিক দৈত্য দানব নই। তোমার মত হৃদয় বলে একটা পদার্থ আমার শরীরেও আছে। তুমি একবার ভেবে দেখো। নিজেকে আমার অবস্থায় ফেলে একবাব ভেবে দেখো দিকিনি। তোমার ওপর মিথ্যে রাগ করে আমার লাভ কি? বাগ আমি কোনদিন করেছি তোমার ওপরে? যখন প্রথম এসেছিলাম এখানে, তোমায় কি দয়া মায়া মমতা দেখাইনি? মিচেল যখন অসুখে পড়ল তোমাকেই ত ডেকে পাঠালাম তাকে দেখা শুনো করতে। গল্প কবে তার মন ভালো রাখতে। তাব কি এই প্রতিদান তুমি আমায দিলে? আমি তোমার মঙ্গল চাইছিলাম, আর তুমি গোপনে গোপনে আমারই সর্বনাশের পথে পা বাড়ালে। এই কি কৃতজ্ঞতা তোমাব? অন্তত এর চেয়ে আর একটু ভালোই তোমাকে ভেবেছিলাম আমি।

কাছে এসে ছোটকর্তা আমাব বাহুমূলে আদর করলেন। তাব সবল হাতেব চাপে এখুনি যেখানটা আমাব যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল, সেইখানে কত আদবে তিনি হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

দোষ দিই না অবশ্য তোমায়। মাথা গরম আমাদের সকলেবই। তোমারই বা একা দোষ দেবো কেন? কি যে আমাদের ভাল, কি যে আর সকলের ভাল, এসব কথা আমরা ভাল করে বিবেচনা করতেই চাই না। নিজেরটা নিয়েই মেতে ওঠা আমাদের স্বভাব। কিন্তু তবু তোমায় জিজ্ঞেসা করি, কি লাভের লোভে তুমি এই পথে যাচ্ছ? সদ্য সদ্য হয়ত কিছু লাভ হবে তোমার, কিন্তু সে ক'দিনের? আমি

তার বাবা, এ বাড়ির সর্বময় কর্তা আমিই। মিচেল নয়। আমি সংসারী মানুষ। আমার কাছে তোমাদের এই সব ছেলেমানুষীর কোন দাম নেই। দাম থাকতেও পারে না। যে আশা তোমার জীবনে সার্থক হতে পাবে না, সে আশা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। মিথ্যে নিজের মনকে ঠকাচ্ছ কেন ?

একটুখানি দম নিয়ে ছোটকর্তা আবার বললেন—

অবশ্য যে পথে তোমরা যাচ্ছিলে সে বড়ো নোংরা পথ। সে পথে গেলে শেষ অবধি তোমার ভাগ্যে কি হত সে বোঝবার বয়স তোমার হয়েছে। কিন্তু সে পথে যেতে তোমায় আমি দেবো না। তোমার মঙ্গল অমঙ্গলের ভার যখন আমার হাতে এসে পড়েছে, আমি তার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করব। যাতে তুমি সুস্থ সুন্দর জীবন চালাতে পার, তার একটা পাকা বন্দোবস্ত আমি করে দিচ্ছি। তোমার যে রকম বুদ্ধি-সুদ্ধি, তোমার যত গুণ, সে সব আমার মত আর কেউ জানে না। ও সব জিনিস আমি নষ্ট হতে দেব না। কিন্তু তার চেয়েও যা বড়ো, সে হল তোমার রূপ। আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, তবু তোমার ঐ চোখের দিকে তাকালে আমারই শরীর কেমন হয়ে যায়। তোমার ঐ রূপ আমি যেখানে সেখানে নষ্ট হতে দিতে পারিনা।

কথাগুলো শুনে শরীরের ভিতর দিয়ে একটা সাপ যেন হিলহিল করে বেড়াতে লাগল। তার কথা যেন আমার বিশ্বাস হতে চাইল না। প্রথমে ভাবলাম যে হয়ত মিচেলকে ছেড়ে দেবার ঘুষ হিসাবে ছোটকর্তা আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিতে চাইছেন। কিন্তু সেই অভ্যাস হয়ে যাওয়া অন্ধকারে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভুল ভাঙল। দেখলাম মৃদু মৃদু হাসছেন তিনি। আমার দিকে আঙুল নেড়ে বললেন—কি গো। মনে ধরল আমার কথা ? রাজী ত ?

রাজী! অন্যমনস্ক ভাবেই যেন কথাটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

ছোটকর্তার পাতলা হাসি আমার চোখে পড়ল। কানে বাজতেই সমস্ত শরীর আমার রি রি করে উঠল।

তোমরা সব এক জাতের। দেখে আসছি কিনা চিরকাল। কাঁচা বয়সের মেয়েরা ছোকরা পেলে বাঁচে না। খাদ্য পানীয় সব তোমাদের ঐ এক। কিন্তু ভালবাসা বুঝি ছোকরাদের একচেটে। বয়স হয়েছে যাদের তারা বুঝি ভালবাসতে ভুলে যায়। তারা বুঝি ভালবাসতে পারে না? আমার মত পুরুষেরা খুব ভালবাসতে পারে গো। আমাদের ভালবাসা হোল পাহাড়ের মতো। একবার মন বসল ত আর টলবার পাত্র নয়। ঐ সব ছোকরাদের হোল সন্ধ্যাবেলার ফুল। এই আছে ত এই নেই। খুব হৈচৈ করে আরম্ভ করে কিন্তু থাকে কতক্ষণ। বিশ্বাস করতে পারছ না বুঝি। এই এসোনা কাছে। দেখো না নিজেই পরখ করে—

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে আমি সর্বশক্তি দিয়ে সেই বুড়োটার বুকে ঘুষি মারলাম। হঠাৎ এই ধাক্কা খেয়ে লোকটা যেন টলে পড়ে যাবার মত হোল। আমার শরীরে তখন ভৈরবী ভর করেছে। ঐ ঘৃণ্য মানুষটাকে শিক্ষা দেবার জন্যে আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ভয় তখন শরীর থেকে কোথায় চলে গেছে।

লজ্জা করে না আপনার ঐ সব কথা বলতে? জানেন, আপনার দাদা আমার বাবা—

কি বলছ? আচ্ছা—আচ্ছা, তাই বুঝি? রাগে থরথর করতে করতে ছোটকর্তা চেঁচিয়ে ডাকলেন—আইভান, এদিকে এসো।

মুহূর্তের মধ্যে ঘরের আর একটি দরজা খুলে বেরিয়ে এল

প্রফেসর। হাতে তার বাতি। তারই আভায় মুখখানি তার দেখতে পেলাম আমি। প্রতিহিংসার পুলকে একটা অশুভ জ্যোতি: জ্বলছে সেই মুখে। চোখে তার আক্রোশের তৃপ্তি। সেই চোখ দুটি দেখলে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।

এই মেয়েটাকে এখুনি নিয়ে যাও—ছোটকর্তা হুকুম দিলেন তাকে। কম্পিত হাতে আমার দিকে দেখিয়ে বললেন—এটাকে বাড়িতে নিয়ে যাও। ঘরে তালা বন্ধ করে রাখবে। ওর ঘরে যেন কাকপক্ষী ঢুকতে না পারে। যদি এর কোনরকম ব্যতিক্রম হয়, তোমার সর্বনাশ করে দেবো জানবে।

প্রফেসর টেবিলের উপর বাতিদানটি রেখে ছোটকর্তাকে তখুনি সেলাম দিলে। তারপর বিষাক্ত হাসিতে মুখ ভরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কলে-পড়া ইঁদুরের দিকে যেমন করে মানুষ এগোয়, প্রফেসরের ভঙ্গিতে আমার সেই কথাই মনে হোল। লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে শরীর আমার অবশ হয়ে গেল। ঐ মানুষটা সব করতে পারে। সেই ভয়ে আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এসো সুন্দরী। আমার সঙ্গে এসো।

আমার হাত ধরে প্রফেসর নিয়ে চলল। আমি যে পালাবার চেষ্টা করব না, সে কথা বুঝতে তার দেরী হয়নি। ছোটকর্তার অশুচি সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই তখন আমি বাঁচি।

প্রফেসরের সঙ্গে একরকম ছুটেই আমি ঘর থেকে পালিয়ে এলাম।

সারা পথটা নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরিয়ে রাখলে প্রফেসর। তার সেই চাপা হাসির শব্দ যেন আমার প্রাণের ভিতর মাদলের মত বাজতে লাগল।

বাড়িতে পৌঁছে জানালা দরজা বন্ধ একখানা ঘরে সে আমায়

বন্দিনী করে রাখলে। যাবার সময় আমায় একটা সেলাম দিয়ে গেল যেমন দিয়েছিল ছোটকর্তাকে।

বান্দাকে বিদায় দিন রাজকুমারী—বললে প্রফেসর—পাখী তোমার পালাল। তাকে খাঁচায় বাঁধতে পারলে না সুন্দরী। তবে জাল বিছিয়েছিলে ভাল। টেনে তুলতে পারলে না তাই—বলে হো হো করে হাসলে প্রফেসর।

শেষবারের মত দরজাটা বন্ধ করবার সময় একবার মাথা গলিয়ে বলে গেল—অপমানের প্রতিশোধ কেমন নিলাম দেখলে ত। সাপের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিলে—

ঘরের চাবিটা ঘুরে যাবার পর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ভয় ছিল প্রফেসর হয়ত আমার হাত দুখানা বেঁধে দিয়ে যাবে। কিন্তু হাত দুখানা আমার নিজেরই রইল। সেইটুকুই আমার যা স্বস্তি।

জামার সিল্কের ফিতেটা ছিঁড়ে ফেললাম আমি। সেই ফিতে পাকিয়ে একটা ফাঁস করে গলায় জড়িয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু কি মনে করে গলায় দিলাম না।

অপরিসীম বিদ্রোহে চেঁচিয়ে বললাম—কিসের জন্যে মরব আমি? মরলে ত তোমাদের জিত। কিন্তু জিততে তোমাদের আমি দেবো না। এ জীবন আমার মিচেলের হাতে সঁপে দিয়েছি। সে আমায় বাঁচাবে। তোমাদের এই নরক থেকে সে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

আমার মিচেলও যে শত্রু পুরীতে বন্দী। ভাবতেই চোখের কোল ফেটে আমার জল এল। বিছানায় পড়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলাম আমি। পাছে প্রফেসর দরজার আড়ালে কান পেতে আমার কান্না শুনে হাসে সেই ভয়ে মুখে চাপা দিয়ে আমি কান্না গিলতে লাগলাম।

শরীর আমার ভেঙে পড়েছে। সকাল থেকে লিখতে বসেছি। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এই লেখা থেকে উঠে পড়লে আর আমি লিখতে পারব না। হয়ত আমার শেষ কথা না লেখাই থেকে যাবে চিরদিন। যত কষ্টই হোক, সে বেদনার কাহিনী আমি শেষ করবই। তা না হলে মরেও আমি শান্তি পাব না।

চব্বিশ ঘণ্টা পরে একখানা ঢাকা গাড়ী এল আমায় নিয়ে যেতে। সেই গাড়ীতে করে তারা আমায় চাষীদের পাড়ায় একখানা ফাঁকা কুঁড়েতে নিয়ে গেল। ছ সপ্তাহ সেই ঘরে নজরবন্দী অবস্থায় কাটল আমার। সেই সময় একটি মুহূর্তও আমার স্বস্তিতে কাটেনি।

পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যেদিন থেকে নিচেল এ বাড়িতে এসেছিল, সেইদিন থেকেই প্রফেসর আমাদের সতর্ক পাহারায় রেখেছিল। যে চাকর আমায় চিঠিখানা পৌঁছে দিয়েছিল, তাকে টাকা ঘুষ দিয়ে চিঠিখানা পড়ে নিয়েছিল প্রফেসর।

যেদিন রাত্রে আমার সঙ্গে ঐ ব্যাপার ঘটে তার পরের দিন সকালে বাপ-ছেলেতে এক বিশ্রী মনান্তর হয়। ছেলে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বলে গেছে যে এ বাড়িতে আর কোনদিন সে ফিরবে না। কিন্তু প্রফেসরের তাতে কিছু ভাল হয়নি। যে তীর সে আমার দিকে ছুঁড়েছিল সেই তীরে নিজেই সে আহত হয়েছে।

ছেলে ঐ-ভাবে চলে যাবার পর ছোটকর্তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল প্রফেসরের ওপর। তাকে জমিদারী থেকে সরিয়ে দিলেন তিনি। অবশ্য মোটা টাকা দিয়েই তাকে বিদায় করলেন।

প্রফেসর যাবার আগে আমায় আর একবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হোল। অবশ্য কড়া পাহারা মোতায়েন রইল আমার ওপর। এরই ক'দিন পরে আমরা চলে এলাম।

কিন্তু অমন ভাল চাকরীটা চলে যাওয়ার জন্যে প্রফেসর আমাকেই দায়ী করলে। আর সেই থেকে দেখছি আমার ওপর আক্রোশের অবধি নেই তার।

অত চটে যাবার তোমার কি দরকার ছিল শুনি? বুড়োটা অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি করেছিল, কিন্তু তাতে তোমার কি। হুঁ হাঁ করে দুটো দিন কাটিয়ে দিলেই বুড়োটা থিতিয়ে যেত। তখন তোমারও একটা হিল্লে হয়ে যেত, আমারও আখের এমন করে মাটি হোত না। কথায় বলে না মেয়েদের বারো হাত কাপড়েও—তা লাভ হোল কি? তুমি এলে আমার পাল্লায়—আর সে ছোক্‌রারও ছটফটানি ঘুচল না।

এ সব অপমান নীরবে হজম করতাম আমি। ছোটকর্তাকে আর কখনো দেখিনি আমি। ছেলের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার পর মানুষটি যেন ভেঙে পড়লেন। জানিনা শেষ অবধি তার অনুতাপ হয়েছিল কিনা। তবে আমার সঙ্গে তাদের বাড়ির সম্পর্কটা তিনি ইচ্ছেমত উড়িয়ে দিতে পারলেন না। তাই আমার নামে মাসোহারা ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। যতদিন না আমার বিয়ে হচ্ছে ততদিন অবধি প্রফেসরের হাতে আমার মাসোহারার টাকা আসবে। সে টাকা আমায় তার হাত থেকে নিতে হবে। সেই আমার লজ্জার টাকা।

মস্কোতে এসে প্রফেসর বাসা বাঁধলেন। তার কাছে, তার বাসায় একটা দিন আমি থাকতে চাইনি। যে দিকে দু চোখ যায় আমি চলে যেতাম। পুলিসে খবর দিতাম আমি। কিংবা হয়ত বাঁচবার রাস্তা খুঁজতে আরো বড়ো কারুর কাছে আর্জি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতাম। তারপর কি হত, তা আর আমি ভাবতে পারি না। কিন্তু কিছুই আমার করা হয়ে ওঠেনি।

দেশ থেকে চলে আসবার দিন, আমাদের বড় বাড়ির একজন ঝি আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়েছিল। সে আমার মিচেলের লেখা চিঠি। সে ত চিঠি নয়, সে আমার মৃতদেহে প্রাণশিখা। সেই চিঠিতে কতবার ঠোঁট ছুঁয়েছি তা বলতে পারি না। কত কান্নায় ভিজে গেছে তার লেখা।

সেই চিঠিতে মিচেল আমায় অনন্ত ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বলেছিল মন খারাপ না করতে। সে চিরকালের জন্যে আমারই থাকবে। আমিই তার বিয়ে করা বৌ। আমাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে জীবনে আর সে গ্রহণ করতে পারবে না। এই চিঠি পেয়ে অভাগিনী যেন বেঁচে উঠেছিল। মিচেল জানিয়েছিল যেন আমি ধৈর্য না হারাই। অপেক্ষা করি তার ফিরে আসার।

মিচেলের কথা আমি ফেলতে পারিনি। অসীম ধৈর্য নিয়ে আমি অপেক্ষা করে বসে আছি। তার সেই চিঠিখানি আমার বুকের খুব কাছে লুকিয়ে রেখেছি। যখনই প্রফেসর আমায় অপমান করে আমি আলতো হাতে আমার বুকের মধ্যিখানটিতে হাত দি। মৃদু হাসি। তখন আর আমার অপমানের ভয় থাকে না। নৈরাশ্যজয়ী সে আমার মহান সংগীত। আমার দিশেহারা জীবনের প্রিয়তম ধ্রুবতারা।

তারপর আরো একখানি চিঠি পেয়েছিলাম মিচেলের কাছ থেকে। তার মধ্যেও সেই একই আশার সুর। অপেক্ষা করো, ধৈর্য ধরো। এ বিচ্ছেদ-রাত্রির অবসান হবে।

অত বড়ো দুঃখ অপমানের পরেও কি করে আমি এমন শান্ত মনে দিন কাটাচ্ছি, এ এক মহা রহস্য হয়ে উঠেছিল প্রফেসরের। সে বোধ করি ভাবত যে, দুঃখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু আশা আমার কুসুম হয়নি। মুকুলেই সে ঝরে গেছে।

সেদিনের সকালটি মনে পড়ছে। প্রফেসর আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। মুখে তার বিশ্ববিজয়ী হাসি। চোখে বিষ মাখা চাউনি। এসেই আমার কোলের ওপর ফেলে দিলেন একখানি খবরের কাগজ। তাতে মিচেলের মৃত্যুসংবাদ।

তারপর আমার কিছু করবার রইল না। নির্বিবোধ ভালমানুষের মত প্রফেসরের ঘরে আমি রয়ে গেলাম। নিজের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা আর আমার মনে থাকল না। দিনরাত আচ্ছন্ন করে রইল মিচেলের স্মৃতি। আমার নাম মুখে করে করবে গিয়ে ঘুমিয়েছে মিচেল। সে খবর তার এক চাকর আমায় এসে বলে গেছে। সে কথা কি আমি ভুলতে পারব কোনদিন। মিচেলকে কি ভুলতে পারব।

সেই বছরই প্রফেসর বিয়ে করলেন। খবর এল যে দেশের বাড়িতে ছোটকর্তা মারা গেছেন। উইলে আমার মাসোহারার টাকা কিছু বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। আমার বিয়ে হওয়া অবধি সে টাকা পাব আমি। আমার অবর্তমানে সে টাকা পাবে প্রফেসর।

এমনি করে বছরের পর বছর গেছে। সাত বছর পার হয়ে গেল। জীবন যেন এগিয়ে চলেছে ভাঁটার টানে। আমি যেন পারঘাটের যাত্রী। নিজের জীবনের ভাঁটি স্রোত দেখছি পারে বসে। সেই স্রোতে আমার জীবনের সব কিছু ভেসে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কিছু করবার নেই। এমন অসহায় আমি।

এমনি করেই বোধ হয় আমার দীপশিখা নিভে যেত একদিন। কিন্তু নিয়তি কেন জানি না আমার জীবনে আবার নতুন আশাবরী বাজালে। নতুন দীপ জ্বলল আমার মনে।

এই অবধি লেখা সেই পাণ্ডুলিপিতে। এর পরের পাতা কি ভাবে

ছিঁড়ে হারিয়ে গেছে। শেষের কটি লাইনেও এমন কাটাকুটি যে তা থেকে পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব হোল আমার।

॥ ১৮ ॥

সেই নিদারুণ ঝড় তুফানের রাতে আমার ঘরে সুসানার হঠাৎ আবির্ভাবে যতখানি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি অভিভূত হলাম তার লেখা পড়ে। সারারাত ছু' চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। ভোর হতে না হতেই জরুরী চিঠি লিখে একজনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ফাস্তোভের কাছে। চিঠিতে জরুরী তাগিদ ছিল পত্রপাঠ মস্কো চলে আসা চাই, নইলে তার অনুপস্থিতিতে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে। সুসানার সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার লেখা পাণ্ডু-লিপির কথাও উল্লেখ করতে ভুললাম না। চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে সারা দিন আর বাড়ি থেকে বার হলাম না। সুসানাদের বাড়িতে এখন কি ঘটছে তাই নিয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করতে লাগলাম বসে বসে। অথচ ওদের বাড়ি যাওয়া সম্বন্ধে মন স্থির করে উঠতে পারছিলাম না। এদিকে মাসিমা যে আমার আচরণে বিরক্ত হয়েছেন তা তাঁর হালচালে প্রকাশ পেতে লাগল। একটি অপরিচিতা কুমারী মেয়ে রাতের অন্ধকারে একা আমার ঘরে এসেছিল, ছুজনে আমরা অনেকক্ষণ নিরিবিলি কাটিয়েছি আর যাবার সময় সে কাঁদতে কাঁদতে গেছে। সে সব খবর গোপন থাকেনি তাঁর কাছ থেকে।

মাসিমা ত কল্পনানেত্রে দেখতে লাগলেন তাঁর বোনপো অতলস্পর্শী বিরাট গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর দীর্ঘশ্বাস, আর্ত কান্না আর বিলাপের বিরাম রইল না। পরের দিনও উৎকণ্ঠিত আগ্রহ নিয়ে

ফাস্তোভের পথ চেয়ে রইলাম। অন্তত একখানা চিঠিও আসবে। সুসানাদের বাড়ির কোন খবর নেই। আর তারা আমাকেই বা খবর পাঠাতে যাবে কেন? জানি সুসানা হয়ত আমারই পথ চেয়ে আছে। কিন্তু ফাস্তোভের সঙ্গে একবার দেখাসাক্ষাৎ না করে ওর সঙ্গে দেখা করার মত মনের জোর আমার ছিল না। তাকে যে চিঠি লিখেছি তার প্রতিটি অক্ষর আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম, ভাবোন্মাদনায় চিঠির ভাষা হয়ত বা একটু কর্কশ হয়ে থাকবে। যাই হোক সন্ধ্যার দিকে ফাস্তোভ এসে উপস্থিত হোল।

// ১৯ //

ওর আসার ভঙ্গিটিতে কোন চঞ্চলতা দেখতে পেলাম না আমি।

ফাস্তোভ তার স্বভাবসুলভ দ্রুত অথচ দৃঢ় পা ফেলে ঘরে ঢুকল। ওকে কেমন যেন বিবর্ণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। অন্তত আমার চোখে সেইরকমই লাগল। সারা দেহে ট্রেণ ভ্রমণের শ্রান্তি জড়িয়ে। কিন্তু মুখে তার অদম্য বিস্ময়, কৌতূহল আব অখুশি। সেইটেই আমার কাছে নতুন বোধ হোল। এ-রকম হৃদযাবেগেব অভিজ্ঞতা যে ওব খুবই কম তা বেশ বুঝতে পারলাম।

আমি ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার চিঠি পেয়েই যে ও চলে এসেছে তার জন্য ধন্যবাদ দিলাম বন্ধুকে। তাবপব সুসানার সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি ওর হাতে দিলাম। জানালার ধারে যেখানটায় বসেছিল সুসানা, সেও সেইখানে গিয়ে পাণ্ডুলিপিটি পড়তে আরম্ভ করে দিল। ঘরের আর এক ধারে একটি কোণ বেছে নিয়ে আমি একখানা বই খুলে বসলাম। কিন্তু পড়া আমার মোটেই এগোচ্ছিল না। একথা

স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে বই পড়ার ছলে আমি আড়চোখে লক্ষ্য করছিলাম ফাস্তোভকে।

পাণ্ডুলিপিটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখেরও ভাবপরিবর্তন হতে লাগল। প্রথমে দেখলাম শান্ত নিরুত্তেজিতভাবে পড়ে যাচ্ছে। তারপর পাতায় পাতায় তারও কৌতূহল দ্রুতগতি হয়ে উঠল। দেখলাম তার চোখের তারা যেন লাইনগুলোর উপর দিয়ে নক্ষত্র বেগে ছুটে চলেছে। পাণ্ডুলিপিটি পড়া শেষ হলে ভাঁজ করে রাখলো ফাস্তোভ। চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবলে, তারপর আবার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লো। পড়া শেষ করে পাণ্ডুলিপিটি পকেটে পুরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু তখুনি কি ভেবে ফিরে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল।

ওর প্রতি বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে—গভীর আবেগের সঙ্গেই বলল ফাস্তোভ—সত্যিই আমি অমার্জনীয় অপরাধ করেছি। অতি নিষ্ঠুরের মত কাজ করেছি। ভিক্টরের কথাই আমি বিশ্বাস করেছিলাম।

বল কি? ওকে ত তুমি ঘৃণা করতে। কিন্তু কি বলেছে ও তোমায়?

ফাস্তোভ হাত দুটি জড়ো করে একটু কাত হয়ে দাঁড়াল। ও যে দারুণ লজ্জিত হয়েছে বুঝতে পারলাম আমি।

মনে পড়েকি ভিক্টর কি একটা মাসোহারার কথা বলেছিল। ঐ কথাটাই কেন যেন আমার মনে বিঁধে গিয়েছিল। ঐ কথাটাই যত অনিষ্টের মূল। আমি অনেকবার ওকে প্রশ্ন করেছিলাম। ও বললে—

কি বললে?

বললে কে একজন—কি যেন নামটা? সেই সুসানার জন্যে ঐ মাসোহারার ব্যবস্থা করে গেছে। মানে সুসানার সঙ্গে কি একটা অবৈধ—অর্থাৎ তারই ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

তুমি বিশ্বাস করলে ওর কথা?

ফাস্তোভ মাথা নেড়ে সায় দিলে। তা বিশ্বাস করেছিলাম বই কি। ও আমায় বলেছিল—ঐ লোকটির ছেলের সঙ্গেও নাকি সংসর্গ করেছিল সুসানা—না ভাই, সত্যি বড়ো অন্যায় করেছি। আমার এ কাজের মার্জনা নেই—কোন যুক্তি কৈফিয়ৎ নেই।

ঐ কথা শুনেই তুমি সম্পর্ক চুকিয়ে দিলে? আর কিছু ভাবলে না, জানলে না?

সে তুমি বুঝবে না বন্ধু। ঐরকম কথা কোন মেয়েমানুষের সম্বন্ধে শুনলে, এইটাই ত একমাত্র পথ। আমি অতি নিষ্ঠুরের মত কাজ করেছি। সত্যি যা-তা করে ফেলেছি।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। কী যেন একটা গভীর লজ্জার কাজ করেছি আমরা—তাই আর মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু আমার ত আর সত্যি লজ্জিত হবার কিছু ছিল না।

॥ ২০ ॥

ঐ ভিক্টরের মুখ আমি গুঁড়িয়ে দিতাম—দাঁতে দাঁতে চেপে নিষ্ঠুর আক্রোশে বললে ফাস্তোভ—ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতাম যদি না জানতাম যে আমার নিজেরই দোষ আছে। এখন বুঝতে পারছি সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কেন করেছে তাও বুঝতে পারছি। সুসানার বিয়ে হয়ে গেলে মাসোহারাটা বন্ধ হয়ে যাবে কিনা। পাষণ্ড—পাষণ্ড ওরা।

আমি ফাস্তোভের হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিলাম। কোমল কণ্ঠে বললাম—সে কথা যাক ভাই। তুমি সুসানার কাছে গিয়েছিলে ?

না। বাড়ি থেকেই ত সোজা এখানে চলে আসছি। কাল যাব। যা হবার হয়ে গেছে। কালই এর একটা বিহিত আমি করছি। কালই।

কিন্তু সুসানাকে কি সত্যিই তুমি ভালবাস।

আমার প্রশ্নে যেন বিরক্ত হল ফাস্তোভ।

নিশ্চয়ই ভালবাসি। ও আমার সর্বস্ব।

সত্যি ভারী ভাল মেয়ে। এমন নরম কোমল।

ফাস্তোভ অধৈর্যের সঙ্গে পা দিয়ে মাটি ঠুকতে লাগল। বললে —তুমি তার সম্বন্ধে কি ভাব তা আমি জানি না, জানতে চাইও না। আমি ওকে বিয়ে করবার জন্যে ঠিক করেছিলাম। ঐ আমার বাগদত্তা। এখনও ওকে বিয়ে করতে আমি রাজী। বয়সে সুসানা আমার চেয়ে বড়ো। তা হোক তবু—

ঠিক সেই মুহূর্তে কি জানি হঠাৎ আমার কেমন যেন হোল। দেখলাম বিবর্ণ একটি মেয়ে হাতে মাথা রেখে অসহায় ভাবে জানলায় ঠেসান দিয়ে বসে আছে।

মোমবাতির শিখা পুড়ে আলোর জোর কমে আসছিল। ঘরের ভিতর ঘনায়মান অন্ধকার। একটা অ-চমকা আতঙ্কে আমার বুকের ভেতর ছুর ছুর করে উঠল। সেই স্তিমিত প্রদীপ আলোকে উত্তেজিত মনকে যথাসাধ্য প্রশমিত করে আর একবার চেয়ে দেখলাম আমি। এবার আর জানালার ধারে কাউকে চোখে পড়ল না। কিন্তু কি একটা অদ্ভুত অনুভূতি। ভয় বল, বেদনা বল, করুণা বল—কিংবা

সব কিছু মিলিয়ে কি একটা অনাস্বাদিত অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি।

আর সেই মুহূর্তে গভীর আবেগে আমি ফাস্তোভকে মিনতি করলাম, ভাই এখুনি একবার সুসানার ওখানে যাও। কালকের জন্যে যাওয়া মুলতুবী রেখ না। আমার মন বলছে আজই সুসানার সঙ্গে তোমার দেখা করা উচিত। কি জানি—

কিন্তু ফাস্তোভ আবেগে সাড়া দিলে না। শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে, কি যে বল? এখন রাত এগারটা। ওরা সবাই এতক্ষণ শুয়ে পড়েছে।

তা হোকগে। তবু তুমি যাও—আমি মিনতি করছি, যাও। আমার মনে একটা অন্য সংকেত পাচ্ছি। ভাই, যা বলছি একটিবার শোন। একবার ঘুরে এস।

কিন্তু ফাস্তোভকে জাগাতে পারলাম না আমি। সে তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বললে, পাগল হলে নাকি? এই রাত্রে অসম্ভব। কাল সকালে নিশ্চয় যাব। সব গোলমাল পরিষ্কার করে দিয়ে আসব।

কিন্তু ফাস্তোভ তুমি ভুলে যাচ্ছ সুসানা লিখেছে—ও মরতে বসেছে। ওকে আর জীবন্ত দেখতে পাবে না। যদি সেদিন ওর মুখখানি দেখতে, ওর মত মেয়ে ছুটে এসেছিল আমার কাছে—তার জন্যে ওকে কত না ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।

ওর মনের ভাব একটু উঁচু পর্দায় বাঁধা—তেমনি শীতলকণ্ঠে বললে ফাস্তোভ। আত্মপ্রত্যয় যেন ফিরে পেয়েছে ও।

বললে, প্রথম প্রথম সব মেয়েই ঐ রকম। আমি বলছি কাল সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন চলি। আমি ভারী ক্লান্ত—ঘুমে চোখ বুজে আসছে।

টুপিটা হাতে নিয়ে ফাস্তোভ ঘর থেকে চলে গেল।

কিন্তু কথা দাও কাল সকালে ওখান থেকে সোজা এখানে চলে আসবে। বলবে কি হোল ?

পাছে সারারাত্রি বিশ্রামের পর কথাটা ভুলে যায় তাই শেষবারের মত ওকে স্মরণ করিয়ে দিলাম আমি।

ঠিক আছে—যেতে যেতে বললে ফাস্তোভ। ফিরেও তাকাল না।

॥ ২১ ॥

কে যেন আমার কাঁধে হাত রেখে বেশ কয়েকবার ঝাঁকুনি দিল আমায়। চোখ খুলে তাকালাম। ঘরে একটিমাত্র মোমবাতি জ্বলছিল। তারই ক্ষীণ আলোয় দেখলাম ফাস্তোভ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। একি চেহারা হয়েছে ওর। মনে হোল যেন হাঁপাচ্ছে। হলদে বিবর্ণ ঠোঁট দুটো ঝুলে পড়েছে। বিনিদ্র চোখে অর্থহীন শূন্যগর্ভ দৃষ্টি। কোথায় গেল সেই সদাহাস্যমধুর মূর্তি ? পক্ষাঘাতে আমার এক আত্মীয় কেমন যেন জড়ভরত হয়ে যাচ্ছিল দিন দিন। সেই মুহূর্তে ফাস্তোভকে দেখে তার কথাই আমার মনে পড়ল।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম।

কি ব্যাপার ? হয়েছে কি ?

কোন উত্তর দিল না ফাস্তোভ।

বলো কি হয়েছে ? কথা বলো ফাস্তোভ। সুসানা কেমন আছে ?

সুসানার কথা কানে যেতেই ও যেন চমকে উঠল।

সুসানা—তার নাম উচ্চারণ করতেই গলার স্বর ধরে এল ফাস্তোভের।

সুসানা আর নেই।

নেই মানে ?

নেই। সুসানা মারা গেছে।

আমি বিছানা থেকে লাফ মেরে উঠে বসলাম।

মারা গেছে ? সুসানা মারা গেছে ?

কাস্তোভ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

হ্যাঁ। সুসানা মারা গেছে। কাল মাঝরাতে।

ও নিশ্চয় পাগলের প্রলাপ বকছে—মনে মনে ভাবলাম আমি।

মাঝ রাতে ? কটা তখন ?

সকাল আটটায় ওরা লোক পাঠিয়েছিল আমাকে খবর দিতে। আগামী কাল ওকে গোর দেওয়া হবে।

আমি ওর হাত চেপে ধরলাম।

কাস্তোভ তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। প্রলাপ বকছ না ত ?

মাথা আমার ঠিকই আছে। নিজের কানে শুনেছি। তারপর সোজা চলে এসেছি তোমাদের এখানে।

অপূরণীয় ক্ষতির কথা শুনলে যেমন হয় তেমনি অসুস্থ নিরুপায় বোধ করতে লাগলাম আমি। হাত পা যেন ঠাণ্ডা আড়ষ্ট হয়ে এল।

হায় ভগবান! মারা গেল। বার বার আমি আবৃত্তি করতে লাগলাম নিজের মনে মনে।

কি করে মারা গেল। এত হঠাৎ কি হোল ? আত্মহত্যা করেনি ত অভিমানিনী ?

তা আমি জানি না। কিছুই জানি না। ওরা খবর দিয়েছে কাল মাঝ রাতে সুসানা মারা গেছে। আসছে কাল ওকে কবর দেওয়া হবে।

মাঝ রাতে?

তখন আমার মনে পড়ল। মাঝ রাতে ঠিক যখন আমি ওকে জানালায় বসে থাকতে দেখেছিলাম। কত মিনতি করে বলেছিলাম ফাস্তোভকে একবার ওর কাছে যেতে। তখনও বেঁচে ছিল সুসানা। তখনও বেঁচে ছিল। গেলে, শেষ দেখা হোত।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন বললে ফাস্তোভ।

কাল যখন তুমি আমাকে ওদের বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছিলে তখনও বেঁচে ছিল সুসানা।

কতটুকুই বা ও বুঝতে পেরেছে সুসানাকে? আমিই বা কতটুকু ওকে চিনতে পেরেছিলাম?

আবার আমার ভাবনা উধাও পাখা মেলে দিল।

ওর মনের বীণার তার উঁচু সুরে বাঁধা। সব মেয়েই ঐ রকম। নিষ্ঠুর পুরুষ যখন খেয়ালের খেলা খেলছিল হয়ত ঠিক সেই সময় সুসানা ঠোঁটের কাছে তুলে ধরেছিল বিষের পেয়ালা। এত সাধের প্রাণ নিজের হাতে নষ্ট করে দিলে। কি জানি, ভালবেসে এমন মারাত্মক ভুল কি কেউ করে? ভালবাসার ধনটিকে এমন অবহেলায় যেতে দেয়?

আমার বিছানার পাশে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল ফাস্তোভ। দাঁড়িয়ে রইল অপরাধীর মত।

॥ ২২ ॥

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলাম আমি। ফাস্তোভকে বললাম—তাহলে এখন কি করতে চাও তুমি?

বন্ধু আমার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন আমি কি

এক অসম্ভব প্রশ্ন করলাম তাকে, সে ভেবেই পেল না। আর সত্যিই ত, কি করবারই বা ছিল আর।

তবু আমি বললাম, এখন তোমার উচিত ওদের বাড়ি গিয়ে মৃত্যুর কারণটা হদিস করা। কে জানে হয়ত কোন জঘন্য অপরাধ আছে এর পিছনে। ঐ সব লোক যা তা করতে পারে। ওর পাণ্ডুলিপির সেই জায়গাটা মনে আছে। বিয়ে হলে ওর মাসোহারা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সুসানা মারা যায়, ওর মাসোহারার টাকাটা পাবে প্রফেসর। জিনিসটা তোমায় খোঁজ নিতে হবে ভাই। ওর প্রতি শেষ কর্তব্যটুকুও ত করা উচিত আমাদের।

বড় ভাইয়ের মত আমি ফাস্তোভকে উপদেশ দিলাম। অপার শোকের এই শোচনীয়তার মধ্যে নিজেকে আমার ফাস্তোভের চেয়ে অনেক বড়ো মনে হতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম, সে যে অন্যায় করেছে এই জন্যে নিজেকে হয়ত অপরাধী ভাবছে ফাস্তোভ। হয়ত আচম্বিতে এত বড়ো দুঃখ পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে সে। দেখেছি কিনা দুর্ভাগ্য মানুষকে ভারী অসহায় করে ফেলে। তাকে লোক-চক্ষুতে নামিয়ে দেয়। ভগবান সাক্ষী, সেই মুহূর্তে ফাস্তোভকে নিতান্ত ছেলেমানুষ মনে হতে লাগল আমার। ওর জন্যে মন আমার করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠল। ভাবলাম ওকে যদি জাগাতে হয় কঠোর আমায় হতেই হবে। এই বিপদের গহ্বর থেকে টেনে ওপরে তুলতে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। মেয়েদের সমবেদনায় তাই বোধ হয় কোমলতার লেশ থাকে না।

কিন্তু ফাস্তোভ তেমনি উদ্‌ভ্রান্তের মত বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম তবু ওর বিমূঢ়তা কাটল না। আমার কোন কথাই যে তার মনে দাগ কাটতে পারেনি তা

বুঝতে আমার দেরী হোল না। তবু আবার যখন বললাম তাকে, তুমি যাচ্ছ ত সেখানে? সে শুধু ঘাড় নেড়ে বললে—না।

যাবে না মানে? কি তুমি ফাস্তোভ? কি হোল তার? কেন অমন হঠাৎ সে চলে গেল—সে সব কিছুই তুমি জানতে চাও না? সুসানা হয়ত তোমার জন্যে কোন চিঠি রেখে যেতে পারে। হয়ত এমন কোন কিছু যা থেকে তার মৃত্যুর একটা সূত্রও মিলতে পারে।

এ কথার জবাবে সে শুধু মাথা নাড়লে। তারপর জড়িত গলায় বললে—আমি যেতে পারব না। সেই কথাটাই তোমায় বলতে এসেছি আমি। তুমি একবার যাও ভাই। আমি যেতে পারব না সেখানে—আমি যেতে পারব না—আমি যেতে পারব না।

টেবিলে বসে পড়ে ফাস্তোভ দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—তাকে যে আমি বড়ো ভালবাসতুম। বড়ো ভালবাসতুম তাকে।

সেই মুহূর্তে একটা নতুন জিনিস অনুভব করলাম আমি ফাস্তোভের পাশে দাঁড়িয়ে। আজ আর সে-কথা স্বীকার করতে একটুও লজ্জা নেই আমার। বন্ধুর সেই আর্ত কান্না আমার মনে কণামাত্র অনুকম্পার উদ্রেক করতে পারেনি। শুধু অবাক হয়ে আমি ভেবে-ছিলাম যে ওর মত মানুষ কি করে অমন শিশুর মত কাঁদতে পারে? পারে অভিনয় করতে? ফাস্তোভকে সেদিন আমার বড়ো স্বার্থপর মনে হয়েছিল। বড়ো নীচ। অন্তত ঐ অবস্থায় পড়লে আমি তার মত কেঁদে কর্তব্য পালন করতাম না।

সেদিন সে যা ব্যবহার করেছিল তাতে ঐ কথা ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারিনি আমি তার সম্বন্ধে। যদি দেখতাম যে অত বড়ো দুঃখের মধ্যেও সে বিচলিত হয়নি, হয়ত তাকে ঘৃণা করতাম আমি।

কিন্তু নীচ ভাবতে পারতাম না। জানতাম যে মেয়েমানুষের মন নিয়ে যারা খেলে বেড়ায়, সেও তাদের দলে। যত রাগই হোক অন্তত তাকে ভণ্ড বলতে পারতাম না।

জীবনে অনেক কিছু দেখে তবে এই কথা বুঝেছি যে দুঃখের দিনে মানুষের চেহারাটার মধ্যেই তার চরিত্রের ছাপ ফুটে ওঠে। কেউ কেউ হয়ত সত্যিকার সমবেদনা পায়। কারুর বা ভণ্ডামির কান্নায় গোপন পাপ ঢাকা দেবার মিছে চেষ্টা কিছুতেই চাপা থাকে না।

॥ ২৩ ॥

সুসানার বাড়িতে কাস্তোভকে পাঠাবোই এমনি একটা দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে ছিলাম। কিন্তু শেষ অবধি আমায় হার মানতেই হোল। বাধ্য হয়ে বেলা বারোটা আন্দাজ আমি নিজেই তাদের বাড়ির দিকে যাবার জন্য পা বাড়ালাম। রাস্তার মোড় ফিরতেই ওদের বাড়িটা আমার চোখে পড়ল। জানালায় রাখা কটা মোমবাতি হলুদ শিখায় জ্বলছিল। দেখে কেমন একটা অস্বস্তিকর আতঙ্কে আমার সারা শরীর ছমছম করতে লাগল। একবার ভাবলাম কি হবে গিয়ে সেই মৃত্যুপুরীতে। তার চেয়ে বরং ফিরেই যাই। কিন্তু কোনমতে সাহস জড়ো করে আমি ঢুকে পড়লাম ওদের বাড়িতে। বাড়ির বাতাস ধুপধুনো আর পোড়া মোমবাতির গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। এক দিকে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা সাদা জড়ি বসানো লাল রংয়ের কফিনের ঢাকনাটা রয়েছে। পাশের একটি ঘর থেকে মৌমাছির গুঞ্জনের মত পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের ক্লান্ত সুর ভেসে আসছে। ড্রয়িং রুম থেকে কে ঘুম চোখে আমায় ডাকলে। বললে—

ভিতরে আসুন। দিদিমণিকে শেষ দেখা দেখে যান।

খাবার ঘরের দরজাটা আমায় দেখিয়ে দিল সে। ভিতরে ঢুকলাম। দরজার দিকে শিয়র করে পাতা রয়েছে কফিনটা। উঁচু করা বালিসের উপর ফুলের মালা দিয়ে ঘেরা সুসানার মাথার একরাশ কালো চুল সব প্রথম আমার চোখে পড়ল। এক পাশে সরে এলাম আমি।

তারপর ক্রশ করে নতজানু হয়ে বসলাম মাটিতে। তাকিয়ে দেখলাম সেই শেষ ছবিখানির দিকে। মুখের কোথাও এক তিল লাবণ্য নেই। জীবনে যে সুখ পায়নি, মৃত্যুর কোলেও কি তার শান্তি মেলেনি?

সন্ত মৃতের মুখে যে স্নিগ্ধ শান্তির ছায়া পরিব্যাপ্ত থাকে, তাও যেন রূঢ় হাতে মুছে দিয়েছে নিষ্ঠুর শমন। সুসানার বাদামী রংয়ের ছোট্ট মুখখানির দিকে তাকিয়ে প্রথমেই আমার খুব পুরানো ধর্মচিত্রের কথা মনে হোল। দারুণ হতাশায় ও আর্তনাদ করতে যাচ্ছিল—এমন সময় চিরদিনের মত রুদ্ধবাক হয়ে গেছে। উদ্‌গত আর্ত কান্না থেমে গেছে মাঝপথে। এ-জীবনে আর সে কান্না শোনা গেল না। এমন কি চোখের কোণে ভ্রূকুটিটুকুও অক্ষুণ্ণ আছে। হাতের আঙুল-গুলো পিছনের দিকে বেঁকে রয়েছে।

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম এই ভয়াবহ মৃত্যুর দৃশ্য থেকে। কিন্তু সেও মুহূর্তের জন্যে। তখুনি আবার কৌতূহল ভরে মৃত দেহের দিকে তাকালাম। কে যেন জোর করে আমার দৃষ্টি সেই দিকে ফিরিয়ে দিলে। তীক্ষ্ণ চোখে খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলাম সুসানার মৃতদেহের কোথাও যদি কোন সন্দেহের সন্ধান পাই। দেখতে দেখতে মন আমার মমতায় ভরে গেল। দেখলাম

মেয়েটির উপর কি অমানুষিক অত্যাচার করেছে এরা। কি কষ্ট দিয়ে হত্যা করেছে তাকে। অথচ কি করে আমি তা প্রমাণ করব ?

আরো অনেকক্ষণ বসে থেকে বিষণ্ণ মনে ফিরে এলাম অন্ধকার গলিপথটার দিকে।

ড্রয়িংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রফেসর বোধ করি আমারই অপেক্ষায়। গায়ে তার ধূসর রংয়ের একটা গাউন। আমাকে ইংগীত করলেন তার ঘরে যেতে। অন্ধকার থমথমে ঘরটি তামাকের গন্ধে ভারী। সেই ঘরে পা দিতেই হঠাৎ শেয়াল কি নেকড়ের গর্তের কথাই আমার মনে হতে লাগল।

॥ ২৪ ॥

ফুসফুসের বাইরের পর্দা ফেটে গিয়েছিল—দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন প্রফেসর—গতকাল সন্ধ্যে পর্যন্ত দিব্যি ভাল ছিল। তারপর কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল। অবশ্য এরকম যে একদিন ঘটবে তা আমি জানতাম। 'ওখানে থাকতে মিলিটারী ডাক্তার নিজে আমায় বলেছিলেন—

এসব কথা ত এই প্রথম আপনার মুখে শুনলাম—না বলে থাকতে পারলাম না আমি।

তোমায় জানাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না। কিন্তু তিনি সব সময় আমায় সাবধান করতেন।

প্রথমটা প্রফেসর নিচু গলায় শুরু করেছিলেন। তারপর ধাপে ধাপে তার গলার স্বর চড়তে লাগল। শেষ অবধি গলা তার ঘরের দেয়াল ছাপিয়ে গম গম করে বাজতে লাগল। যেন সারা বাড়িকে তিনি শুনিয়ে বললেন—তিনি বারবার বলতেন, প্রফেসর খুব

সাবধান। তোমার সৎ মেয়ের বুকের দোষ আছে। একটু উত্তেজনার কারণ ঘটলেই ওর একটা ভালোমন্দ হয়ে যেতে পারে। আমিও ভয়ে ভয়ে ওকে সবসময় উত্তেজনা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতাম। কিন্তু তা কি আর চলেরে বাবা। তুমিই বল না, কাঁচা বয়সের মেয়েরা কি কোনো যুক্তির ধার ধারে, না কথা শোনে—

বলে হা হা করে তিনি হেসে উঠলেন।

দীর্ঘ দিনের স্বভাবে অকারণ হাসিটা যেন প্রফেসরের কথার সঙ্গে লেগেই থাকে। কিন্তু আজ দেখলাম সেই হাসির দমকটা বড়ো বেশি। হাসতে হাসতে প্রবল কাশিতে শরীর বেঁকে গেল তার।

প্রফেসরের বক্তব্যের সার মর্ম শোনা গেল। অন্তত তার কাছ থেকে এর বেশি আর কিছু আদায় করা যাবে না। সে আশা বৃথা। শেষ অবধি জিগ্যেস করলাম—ডাক্তার ডাকা হয়েছিল ?

আমার কথা শুনে প্রফেসর যেন লাফিয়ে উঠলেন—আলবাৎ হয়েছিল। দু'জন ডাক্তার এসেছিলেন। কিন্তু ডাক্তার এসে পৌঁছানোর আগেই সব ফর্সা। দেখে শুনে তারা ঐ একই রায় দিয়েছেন। ফুসফুসের পর্দা কেটে মারা গেছে সুসানা। ওরা শব ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু বাপ হয়ে আমি কি সে প্রস্তাবে রাজী হতে পারি ? আমি রাজী হয়নি।

সমাধির দিন কবে করেছেন ?

কাল সকাল ঠিক এগারটায় মৃতদেহ বেরুবে। এখান থেকে সোজা গীর্জায়। তুমি নিশ্চয় আসছ। তোমার সঙ্গে পরিচয় বেশি দিনের নয়। কিন্তু তুমি আমাদেরই একজন হয়ে গেছ।

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

প্রফেসর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন—সত্যিই, এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।

মরার আগে সুসানা কোনো কিছু বলে যায়নি? কোনো লেখাটেখা?

কিচ্ছু না। কালির একটা আঁচড়ও না। যখন ওরা আমায় ঘুম থেকে ডেকে তুললে সুসানা তখন শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। উঃ সে কি দৃশ্য। বলতে বুক ফেটে যায়। সুসানা আমাদের মনে বড্ড দাগা দিয়ে গেছে। ফাস্তোভ শুনলে বড় ব্যথা পাবে। হ্যাঁ, ও নাকি এখন মস্কোতে নেই?

কিছুদিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিল বটে।

এমন সময় ঝি এসে খবর দিলে—ভিক্টর দাদাবাবু বকাবকি করছে। ওর গাড়ী নাকি অনেকক্ষণ আটকে রয়েছে।

অল্পবয়সী ঝির চোখে মুখে কেমন একটা অশ্লীল দপদপানি। বাড়ির দাসী চাকররা যখন বোঝে যে কর্তা তাদেব হাতের মুঠোয়, তখন এমনিধারা দুর্বিনীত তাচ্ছিল্যই ফুটে বেরোয় তাদের চোখ মুখ থেকে।

দরজার বাইরের দিকে ভারী কি একটা নড়াচড়ার শব্দ হোল। সেই সঙ্গে ভিক্টরের বজ্র গর্জন শোনা গেল।

প্রফেসর কাঁপা গলায় বললেন—তাড়াতাড়ি যাও। দেখ ত ও কি চায়।

প্রফেসরের স্ত্রী তখুনি দু' আঙুল দিয়ে গলায় একটা রুমাল জড়াতে জড়াতে এলেন। গায়ে একটা র‍্যাপার। তখনও জামার বোতাম লাগানো হয়নি—চুলও এলোমেলো। প্রফেসর কেন যেন হঠাৎ তার প্রতি মারমুখো হয়ে উঠলেন।

কানের মাথা খেয়েছ নাকি? শীগগির যাও, ভিক্টর ওর স্লেজের ঘোড়ার জন্যে চেঁচামেচি করছে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর গে, বুঝলে।

আমি নিজে সহীসকে বলেছি। তা ছেলের তোমার মাথা খারাপ। ঘোড়াকে ছোলা খেতে দিয়েছে—উত্তর দিল গিন্নী।

কি জানি কেন, হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন—দেখ ত হঠাৎ কোথা দিয়ে কি সর্বনাশ হয়ে গেল। সুসানাব যে এরকমটি হবে আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি।

ঐ রকম যে ঘটবে আমি কিন্তু সবসময় ভয় করতাম—হাত পা ছুঁড়ে বললেন প্রফেসর—ফুসফুসের পর্দা ফেটে গেছে। হাই-পারট্রফি।

যাই হোক, বড্ড দাগা দিয়ে গেল মেয়েটা।

খসখসে মুখখানি তার বিকৃত হয়ে উঠল। দু ফোঁটা জলও টস টস করে গাল বেয়ে পড়ল। এত অল্প বয়স। কত দেখবার, ভোগ করবার ছিল। হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল।

আদিখ্যেতা থাক। কাজে যাও—মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বললেন প্রফেসর। গিন্নী আর কথা কইলে না। নিঃশব্দে সরে গেল।

আমিও আর রইলাম না।

গলিপথটায় দাঁড়িয়ে ছিল ভিক্টর। মাথায় টুপীটা একটু তেরছা করে বসানো। আমার দিকে তাকাল কি তাকাল না বোঝাই গেল না। আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছি দেখেই বোধ হয় আমার কলারটা একটু টান টান করে নিলে।

ও যে আমায় চিনলে না তার জন্যে আমি ওকে মনে মনে ধন্যবাদ

দিলাম। মনের এই অবস্থায় ওর সঙ্গে আর কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল না আমার।

আমি ফাস্তোভের কাছে ফিরে চললাম।

॥ ২৫ ॥

হাত দুটো বুকের উপর চেপে ধরে ঘরের মেঝেতে বসে ছিল ফাস্তোভ। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছিল মাটির দিকে। কেমন যেন একটা আড়ষ্ট অচৈতন্য অবস্থা। গভীর ঘুম থেকে সদ্য জেগে ওঠা মানুষ যেমন হাবা হাবা চোখে তাকায় তেমনি একটা ঘোলাটে বিস্ময়ের ঘোর ওর চোখে।

প্রফেসরের বাড়ির সব ব্যাপার ওকে বললাম। প্রফেসর আর প্রফেসরগিন্নীর কথাগুলিও উল্লেখ করতে ভুললাম না। ওদের কথাবার্তায় এইটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, হতভাগিনী মেয়েটা আত্মঘাতিনী হয়েছে। আমার কথা শুনে ফাস্তোভের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। তেমনি নিস্মিত বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে আমার দিকে।

তাকে দেখলে তুমি? —শেষ অবধি মুখ খুললে ফাস্তোভ।

দেখেছি বই কি।

কফিনে রাখা অবস্থায়?

অর্থাৎ সুসানার মৃত্যু সম্বন্ধে তখনও সন্দেহ আছে ওর মনে।

হ্যাঁ কফিনে রাখা অবস্থায়।

শুনে ফাস্তোভের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই চোখ নত করে ও হাত ঘসতে লাগল।

শীত করছে?—প্রশ্ন করলাম আমি।

শীত করছে—একটু ইতস্তত করে উত্তর দিল কাস্তোভ। কেমন যেন বোকার মত মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

সুসানা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে, নয়ত বিষ খাইয়ে ওকে হত্যা করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমার গভীর সন্দেহের কথা বললাম ওকে। কিছু না করে সমস্ত ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে ফেলে রাখা অন্যায় হবে। শুনে কাস্তোভ আমার দিকে নিথর দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল শুধু।

কিন্তু কি করবার আছে?—ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকিয়ে ও বললে আমাকে। কিন্তু পর মুহূর্তেই চোখ বন্ধ করে আনত মুখ হয়ে রইল।

জানাজানি হয়ে গেলে ব্যাপারটা খারাপ হয়ে যাবে। হয়ত মৃতদেহ সৎকার করাই মুস্কিল হবে। আমার মনে হয় এ নিয়ে কোনো গোলমাল না করাই ভাল।

কথাটা খুবই সহজ সরল, কিন্তু কেন জানি না এমন সহজ সমাধানটা এতক্ষণ আমার মাথায় ঢোকেনি। ভাবলাম এত দুঃখেও বন্ধুর আমার সাংসারিক বুদ্ধি নষ্ট হয়নি।

ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে কখন?

শুনলাম কাল।

তুমি যাচ্ছ ত?

যাব না? নিশ্চয়ই যাব।

ওদের বাড়ি হয়ে যাবে, না সোজা গীর্জায়?

ওদের বাড়ি যাব—গীর্জাতেও যাব। সেখান থেকে কবরখানায়।

আমি যাব না। আমার যাওয়া চলে না—যেতে পারি না। কাস্তোভ উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ঠিক এই কথাকটি উচ্চারণ

করতে গিয়েই সকালে সে কেঁদে ফেলেছিল। মানুষের কান্নার রীতিই এইরকম। এমন তুচ্ছ কথা আছে অন্যের কাছে যার কোনো মূল্যই নেই, অথচ যা আর একজনের হৃদয়ের তন্ত্রীতে এমন ঘা দেয় যে কান্নার সাগর উথলে ওঠে। তাকে ভেঙে গুড়িয়ে ফেলে। নিজের প্রতি, বিশ্বসংসারের প্রতি মন অপার মমতায় ভবে ওঠে।

কিন্তু সকালের মত এই মুহূর্তেও ফাস্তোভের চোখের জল আমাকে একটুও বিচলিত করতে পারলে না। সুসানা ওকে কোনো কথা বলে গেছে কিনা তা ও কেন জিজ্ঞেস করছে না ভেবে আমার আশ্চর্য বোধ হতে লাগল। ওদের ভালবাসা আমার কাছে রহস্য। যে রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন আজও আমি করতে পারিনি।

দশ মিনিট কাঁদার পর ফাস্তোভ দেওয়ালের দিকে মুখ করে সোফায় শুয়ে পড়ল। শুয়ে রইল স্থানুর মত নিশ্চল হয়ে। আমি ওর মুখের উত্তর শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম কিন্তু সে আমার কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিল না। তখন আমি ওকে ঐ অবস্থায় রেখে চলে আসা মনস্থ করলাম। হয়ত আমার পক্ষে জিনিসটা খুবই হৃদয়হীনতা হবে। কিন্তু কি করব? ফাস্তোভকে দেখে মনে হোল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। অবশ্য এইটাই প্রমাণ নয় যে সে একটুও দুঃখ ভোগ করছে না। হয়ত ওর দুঃখ অন্তঃহীন। ওর বেদনার পরিমাপ করবে কে? ফাস্তোভের প্রকৃতি এমন ধাতুতে গড়া যে গভীর বেদনাময় অনুভূতি তার মনে রেখাপাত করতে পারে না। অন্তত বাইরে তার খুব একটা আভাস থাকে না।

সংসারে সব দিক বাঁচিয়ে যারা পা ফেলে ফাস্তোভও যে সেই জাতের মানুষ, তাতে আর সন্দেহ কি?

॥ ২৬ ॥

পরের দিন বেলা ঠিক এগারটায় আমি সুসানাদের বাড়ি হাজির হলাম। ঝির ঝির করে শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল। হাল্কা কুয়াশার পর্দা মোড়া চারিদিক। বরফ গলতে শুরু করেছে আর সঙ্গে সঙ্গে হাড়কাঁপানো হাওয়ার ঝাপট।

বাড়ির দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রফেসর। গায়ে কালো কোট, মাথায় টুপি। প্রফেসর হাত পা ছুঁড়ে হাঁটুতে চাপড় মেরে হৈ চৈ করে একটা সাড়া জাগিয়ে রেখেছিলেন চারিদিক।

মৃত দেহ বয়ে নিয়ে যাবার গাড়ীটার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল চার জন বিষণ্নমুখ সৈনিক। পুরানো ময়লা কোটের উপর শোকের চিহ্ন হিসেবে কালো ফিতে ঝুলিয়ে নিয়েছে তারা। মাথার টুপি এমন-ভাবে নামিয়েছে চোখের উপর যে ছায়া পড়েছে চোখে। মশালের পিছন দিকের লাঠিটা দিয়ে ওরা জামা থেকে তুষার ঘসে ঘসে ফেলছিল। লাল মুখ প্রফেসরের মাথার চুলগুলো খাড়া দাঁড়িয়ে উঠেছে। গলায় যত জোর আছে সব জোর দিয়ে ভাঙ্গা কাঁশির মত আওয়াজ বের করছিলেন তিনি গলা থেকে।

পাইনের ডালগুলো কোথায়? এদিকে নিয়ে এস। এখুনি শব বের করে নিয়ে আসা হবে। পাইনের ডালগুলো গেল কোথায়? শীগগির আনো—দেরী কোরো না—দেরী কোরো না—

প্রফেসর তখুনি এক ছুটে চলে গেলেন বাড়ির ভিতর। আমার হয়ত একটু দেরী হয়ে গিয়ে থাকবে। প্রফেসর তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করার জন্যে ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছেন। বাড়ির ক্রিয়াকর্মও সমাধা হয়ে গেছে। পুরোহিত দুজন সিঁড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

ওদের মধ্যে যিনি বয়সে তরুণ তেল মেখে চুল বেশ পরিপাটি করে আঁচড়িয়েছেন। দেখতে দেখতে সহীস, দুজন দ্বারী আর ভারীর কাঁধে কফিন এসে পৌঁছল। কফিনের পিছন পিছন এলেন প্রফেসর। এক আঙ্গুল দিয়ে তিনি কফিনটা স্পর্শ করে আছেন। ভাবখানা যেন তিনিও বহন করে আনছেন। মুখে বাহকদের খুব উৎসাহ দিচ্ছিলেন প্রফেসর—ভারী আবার কোথায়—এ বেশ হাল্কা। এদের পিছনে কালো পোশাকে বাড়ির অন্য সব লোক। সবার শেষে ভিক্টর। গায়ে তার নতুন ইউনিফর্ম, হাতে তরবারি। তরবারির হাতলে কালো রেশমী ফিতে জড়ানো। শব বাহকরা কফিনটা এনে গাড়ীতে তুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল সৈন্যদের মশাল। ফট ফট শব্দে মশাল থেকে প্রচুর ধুম উদ্গীরণ হতে লাগল। প্রতিবেশিনী এক বুড়ী হঠাৎ করুণ সুরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন উদাত্ত কণ্ঠে। আর ঠিক সেই সময় প্রবল তুষার বর্ষণ হতে লাগল। প্রফেসর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—আর দেরী নয়। চলো, চলো।

শোকশোভাযাত্রা এগোতে লাগল ধীর পায়ে। প্রফেসরবাড়ির লোকজন ছাড়াও আরো চার পাঁচজন বাইরের লোক শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই শোভাযাত্রায় সুসানার কোন বন্ধু-বান্ধবকে না দেখে আমি একটু অবাক হলাম। কিন্তু তখুনি ভাবলাম যে হয়ত বা এই স্বাভাবিক। নিঃসঙ্গচারিণী ছিল সুসানা। সংসারে তার প্রাণের মানুষ কেই বা ছিল? প্রাণের পড়শী ত ছিল না কেউ। গীর্জায় অবশ্য অনেক লোক এসেছিল। কিন্তু সুসানার আত্মীয় স্বজন তারা কেউ নয়। সবাই বাইরের লোক।

অনুষ্ঠান শেষ হতে বেশি সময় লাগল না।

শেষ বিদায়ের বেলা আমি মাথা নামিয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু কফিনে চুমু খেতে পারিনি। প্রফেসর অবশ্য এই মর্মান্তিক পরীক্ষা সংযমের সঙ্গেই পার হলেন। সামান্য উচ্ছ্বাসও প্রকাশ পেল না তার। কিন্তু বাড়ির ঝিয়ের কান্না আমি ভুলব না। তার আর্ত কান্নার রোল গীর্জার ঘরখানিতে যেন ভেঙে আছড়ে পড়তে লাগল। তবু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলে সে। এই সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে ছিল ভিক্টর। আমার মাসীমাও গীর্জায় এসেছিলেন। কেমন করে তিনি জানতে পেরেছিলেন, যে মেয়েটি সেদিন রাত্রে আমার ঘরে এসেছিল এ মৃতদেহ সেই মেয়েটির। এ ব্যাপারে যে কোনো হাত নেই তা তিনি জানতেন। কিন্তু এই বিচিত্র ঘটনার বিন্যাসে আমার স্থানটি কোথায় তা বোধ করি ঠিক করতেও পারছিলেন না তিনি। মেয়েটি যে আমার প্রতি প্রেমানুরাগে আত্মঘাতিনী হয়েছে এমন ধারণা করাও অস্বাভাবিক নয় তাঁর পক্ষে। কিন্তু তিনিও অপরিসীম শোকে মৃতের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করলেন। দুচোখ দিয়ে তাঁর জল ঝরে পড়তে লাগল। ফিরে যাবার আগে সঙ্গের টাকাকড়ি তিনি গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিয়ে গেলেন।

শেষ বিদায়ের পালা এল। এবার কফিনের ঢাকনি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি একবারও হতভাগিনীর বিকৃত মুখের দিকে তাকাইনি। কিন্তু শেষবারের মত আমি যখন ওর দিকে তাকালাম আমার মনে হোল ঐ মুখের নীরব ভাষায় শুধু একটিমাত্র

কথাই বলতে চেয়েছিল সে—সে কেন আসেনি। কেন আসেনি সে ?

কেন একাজ করলে তুমি সুসানা ?

এ কথার উত্তরে—সে কেন আসেনি ? এই কথাটিই যেন আমার কানে বারবার বাজতে লাগল।

পেরেকের উপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে। আমার ঝাপসা চোখের সামনে একটি বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে গেল।

॥ ২৭ ॥

তারপর কতদিন কেটে গেল।

খুড়িমা মারা গেলেন। মস্কোর বাস তুলে দিয়ে আমি পিটার্সবার্গে গিয়ে উঠলাম। বন্ধু আমার সেইখানে চাকুরী করছিল। তবে দেখাসাক্ষাৎ হত আমাদের কদাচিৎ। শুনেছিলাম আজও অবধি বিয়ে-থা করেনি সে। এখানকার শহুরে সমাজে আনন্দ কুড়িয়ে ফিরছে। কোনোদিন কোনো মেয়ে তাকে ভালবেসে দুঃখ পেয়ে গেছে, সে কথা তার বোধ হয় বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল। অন্তত তার সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে, সুসানার কথা একবারও সে বলেনি আমার কাছে।

এই সময় ব্যবসার প্রয়োজনে মস্কোতে ফিরে এলাম কদিনের জন্যে। এসে যে সব খবর শুনলাম তাতে অবাক হবার আর দোষ কি ?

শুনলাম প্রফেসরের দুর্দশার আর শেষ নেই। বাড়িখানা গেছে আগুন লেগে। চাকুরীটিও গেছে ইতিমধ্যে। ছেলে ভিক্টরের স্বভাবচরিত্রের কোন উন্নতি হয়নি। আজকাল দেনার দায়ে শ্রীঘরেই

তার চিরস্থায়ী বাস হয়েছে। ভালোর মধ্যে প্রফেসরের গিন্নী একজোড়া ছেলে উপহার দিয়েছেন স্বামীকে। দীর্ঘদিনের তফাতে সুসানার স্মৃতির সঙ্গে এই দেশ আমার মনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে দেখলাম। কতবার করে আজ তাকে মনে পড়ল।

বাইরে ঝড়ের হাওয়ায় গাছপালারা উদ্‌ভ্রান্তের মত দুলছে, কাঁপছে, শিরশিরিয়ে উঠছে। ঘরের জানালায় কনকনে তুষার জমে যেন দুধের আস্তরণ পড়েছে। বাড়ির ম্লান আলোয় তাকে দেখতে পাচ্ছি যেন। আমার ঘরের জানালার ধারে নিথর পাষাণীর মত বসে আছে সুসানা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তার বিফল যৌবনের বাসনা। সে বেদনার ছবি বেঁচে থাকতে আমার স্মৃতির পট থেকে মুছবে না কোনোদিন।

আজ ভাবি ফাস্তোভকে কি করে অমন ভাল বেসেছিল সুসানা। যদি বেসেই ছিল ত অত সহজে হতাশায় ভেঙে পড়েছিল কেন? দুটো দিনও অপেক্ষা করতে পারলে না সে? প্রিয়তমের মুখে দুটো কটু কথা শুনে গেলেও অন্তত তার মোহ কাটত। মোহহীন মনে আপন ভাগ্যের পথে যেতে পারত অভাগিনী। কিংবা একখানা চিঠি লিখেও ত ভালবাসার মানুষের কাছে উন্মোচিত করতে পারত নিজের জীবনকে। জানাতে পারত তার অতীত জীবনের কথা। তা না করে এমনভাবে আত্মবিসর্জন দিল কেন অভিমানিনী।

কিংবা কি জানি ভালবাসার রীতিই বোধ হয় এই। প্রেমের এতটুকু অপমান তার সহ্য হয় না। ভালবাসার জনের কাছে সহ্য হয় না এতটুকু অনাদর।

হয়ত এসব আমারই মনের ভুল। ভেবেছিলাম ফাস্তোভকে খুব ভালবাসে সুসানা, হয়ত সে ভালবাসায় ততখানি গভীরতাই ছিলনা

যতখানি আমি মনে মনে ধারণা করে রেখেছিলাম। সংসারের অনেক অভিজ্ঞতায় আজ ভাল করেই জেনেছি যে মেয়েমানুষ দুবার ভালবাসতে পারে না জীবনে।

সংসারের ঘূর্ণিতে পড়ে প্রাণের তরণী তার দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। একদিন বড়ো ইচ্ছায় ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল সুসানা। কিন্তু সংসার শুধু তার ইচ্ছেটাই নয় তার জীবনকে নিয়েই ছিনিমিনি খেলেছিল সেদিন। তার প্রথম যৌবনের মুগ্ধতার কোনো মূল্যই দেয়নি।

জীবনে দ্বিতীয়বার ভালবাসা যে কতখানি মিথ্যে তা বোধ করি সুসানা ভাল করেই জানত। ভালবাসা সে চায়নি। চেয়েছিল একটি নিরাপদ আশ্রয়। একটি নিশ্চিন্ত বন্দর। তারই লোভে জেনে-শুনেই সে ফাস্তোভকে আঁকড়ে ধরতে গিয়েছিল। কিন্তু যেদিন দেখল যে তার একটি মিথ্যা কলঙ্কের কথা লোকমুখে শুনে তাকে পরিত্যাগ করলে ফাস্তোভ, সেদিন বড়ো দুঃখ পেয়েছিল সুসানা। ফাস্তোভ তাকে যত ঘৃণা করেছিল হয়ত সংসারকে তার চেয়ে বেশি ঘৃণা করেছিল সুসানা সেদিন।

আজ ভাবি যে নিরাপদ আশ্রয় সে চেয়েছিল, মৃত্যুর কোলে তা কি পেয়েছে সুসানা। কি জানি। মৃত্যুর রহস্য ত মন্থন করতে শিখিনি।

তবু তার কথা যতবার ভাবি, আমার মনের সেই ভ্রান্তি বারবার ফিরে আসে। মরণাহত বিহগীর অধরে সেই অস্ফুট কথাগুলি শুনতে পাই—সে আসেনি। সে আসেনি। সেদিন যা তার প্রাণের কান্না বলে ভেবেছিলাম আজ মনে হচ্ছে সে তার স্বার্থের মুখরতা। মৃত্যুর আলোতে সুসানা এখন তার মিচেলের হাত ধরেছে। মিচেল

তাকে ভালবেসেছিল। বলেছিল, তোমায় কোনোদিন কাঁদাব না সুসানা। সেই মুহূর্তে ফাস্তোভের প্রবঞ্চনা সইতে পারত না সে। তাই বুঝি প্রাণের স্বস্তি অমন করে শেষ বিদায়ে রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

প্রাণের রহস্য কে কবে জেনেছে সংসারে। জেনেছে কে রহস্য ভালবাসার। সে বুঝি আরো বচনাতীত, আরো গভীর।

ভাগ্যের হাতে যত ব্যথাই পাক, তবু হার মানেনি সে। মৃত্যুর আনন্দলোকে এক অপরূপ বাসর রচনা করেছিল অশ্রুমতী।

শেষ